চিন্তা লহরী

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

প্রণীত

প্রকাশক

রায় এণ্ড কোং

৮১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সোদরপ্রতিম অশেষ গুণালঙ্কৃত, সুকবি,

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল শাখার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলে

দেবকুমার,

তুমিই এই গ্রন্থপ্রচারের হেতুভূত। তোমার আগ্রহেই, আমার বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধ রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তোমারই বঙ্গ-বিশ্রুত নামের সহিত সংযুক্ত হউক।

বরিশাল, গুণমুগ্ধ

১লা আশ্বিন, ১৩২১। লেখক

বিজ্ঞাপন

'সাহিত্য,' 'বিজয়া,' 'ভারতবর্ষ,' 'অর্চ্চনা,' লুপ্ত 'ভারত-সুহৃদ্' ও'বিকাশ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল শাখার কোনো কোনো অধিবেশনে পঠিত কতিপয় প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সরল ভাষায়, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের কতগুলি কথা ও সূত্র, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করাই ঐ প্রবন্ধগুলি গ্রন্থনের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সময়ে লিখিত বলিয়া, উহাতে অসঙ্গতি ও পুনরুক্তি প্রভৃতি অশেষ দোষ পরিলক্ষিত হইবে। বঙ্গ সাহিত্যে এই শ্রেণীর লেখার স্বল্পতা ও গ্রন্থপ্রচারের অন্যতম কারণ।

আবাল্য-বন্ধু সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়, বি-এ. কবিরত্ন মহোদয় এই পুস্তকের মুদ্রণ, সংশোধন ইত্যাদির ভার গ্রহণ করিয়া, আমার উপরে তাঁহার স্নেহের ভার আরো বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বরিশাল,

২৪শে ভাদ্র, ১৩২১। লেখক

সূচীপত্র

চিন্তা-লহরী

পরলোক

প্রথম প্রস্তাব

মৃত্তিকায় বীজ প্রোথিত হইল, বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইল, অঙ্কুর ক্রমশঃ লোচনাভিরাম হরিদ্বর্ণ শস্য-তৃণে পরিণত হইল, তৃণ শিশু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং পরিশেষে শস্য-শালী হইল। শস্য পরিপক্ক হইলেই ওষধির জীবন-লীলা শেষ হইল। সংক্ষেপে ওষধি-জীবনের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও লয়ের এই ইতিহাস! ইহার ভিতরেই নানা-প্রকারের বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও অভিব্যক্তি চলিতেছিল। এই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস একই মহানিয়মে পরিচালিত।

তৃণ-জীবনের পরিণতি—ফলে, এবং এই ফলই তাহার মোক্ষ-ফল। তৃণ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, সকলেরই ইতিহাস প্রায় একরূপ। পুষ্পোদ্যানে কত মনোহর পুষ্পই প্রস্ফুটিত হয়। সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত করে। রূপ-শোভায় কেবল যে

প্রমত্ত মধুকরই আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে; জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানবও তাহাতে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এই পুষ্পের কি নশ্বর জীবন! তাহার সুরভি-শ্বাস ও প্রাণ-মনোহারিণী রূপ-শোভা বিস্মৃত হইবার পূর্ব্বেই ফুল-রাণীর জীবন-লীলা শেষ হয়; কোমল দেহ শুষ্ক হয়; সৌরভ, পূতিগন্ধে পরিণত হয়; সৌন্দর্য্য, কুরূপে বিলীন হয়। ইহাই পুষ্পের বিকার ও পরিণাম। এই ক্ষণিক পুষ্প-জীবনেও, উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ধ্বংসের নিয়ম, ধারাবাহিক-রূপে প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়। জীবজগতেও সেই নিয়ম-ধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত। জীবনের প্রভাত কতই মধুময়, কতই আশাপ্রদ, কতই সুন্দর;—মৃত্যু বা ধ্বংসের করাল-ছায়া সেই আলোক-দীপ্ত মধুর প্রভাতকে পরিম্লান করিতে পারে নাই। আবার জীবনের মধ্যাহ্ন কতই রসাল, কতই উদার, কতই মহান্! শক্তি ও ক্ষমতার পরিপূর্ণতায় এই মধ্যাহ্ন কতই বিস্ময়কর; কিন্তু অপরাহ্নে সেই ক্ষমতা বা শক্তির ক্রমিক হ্রাস ও অপচয়। জীবনের সন্ধ্যাকাল কি ভীতি-সঙ্কুল! মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া আসিল;—আর দৃষ্টি চলিবে না!

মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, আনন্দসূচক উলু ও শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত জনপদ মুখরিত হইয়া উঠিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের কতই আনন্দ, কতই আশা! বর্দ্ধমান শিশুর জীবনে কতই শক্তি সংক্রামিত হইতে লাগিল; দেহ পুষ্ট:ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিল; মনেও ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হইয়া

উঠিল; স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি, স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমূহ উন্মেষিত হইতে লাগিল। শৈশব—বাল্যে, বাল্য—যৌবনে, যৌবন—কৈশোরে পদার্পণ করিল। অবিরাম উন্নতি, অবিশ্রান্ত বিকাশ! প্রচ্ছন্ন ও অভাবনীয় শক্তির অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি! কি মধুময় জীবন! আনন্দঘনের আনন্দ-কণায় কি অপূর্ব্বভাবে উদ্ভাসিত! আত্ম-রক্ষা ও উন্নতির জন্য কি মহা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত! জগৎ বিজয় করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে, আত্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ক্ষুদ্রের ভিতরে বৃহতের, সান্তের ভিতরে অনন্তের, সসীমের ভিতরে অসীমের ছায়া-পাত হইল। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত চেষ্টা, কত উদ্যম!

এই বৃদ্ধি, এই সঞ্চয়, এই অবিরাম উন্নতির যে কখনও শেষ হইবে, তাহা কিছুতেই মনে হয় না। জীবনের প্রতি এত ভালবাসা, কোনওক্রমে যে ইহার শেষ হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও ইচ্ছা হয় না। কিন্তু মানবের ভূয়োদর্শন, বিচার-শক্তি ও প্রজ্ঞা সময়ে সময়ে এই আনন্দকে নিরানন্দেও পরিণত করে। পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল; কেবল তাহা নহে, মরণশীলও বটে। যাহার আদি আছে তাঁহারই অন্ত আছে; যাহার আরম্ভ আছে তাহারই শেষ আছে, যাহার জন্ম আছে, তাহারই মরণ আছে। তৃণ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি সকলই শুকাইয়া যায়, সকলেরই শেষ আছে; সকলেই লয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ-জীবনেও উন্নতি ও বৃদ্ধির সীমা আছে। ইহাদের জীবনে এ প্রকার সময় উপস্থিত হয়, যখন উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির

আরম্ভ হয়; বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবনতি ও ক্ষয়ের প্রারম্ভকেই 'বার্দ্ধক্যের' আগমন বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে এবং বার্দ্ধক্যের শেষাবস্থাই মৃত্যু। চৈতন্য-বিশিষ্ট জীব-জগতেও এই একই নিয়মধারা প্রবাহিত দেখিতে পাই। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যও এই নিয়মাধীন। মানুষ মাত্রেই মরে, জীব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। এই সামান্য কথাটা বলিবার জন্য এত যাগাড়ম্বের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকের মনেই বিতর্ক উপস্থিত হইবে; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে কি আমরা সকলেই মৃত্যুকে জীবন-নাট্যের পটক্ষেপণ বলিয়া মনে করি? আমরা অনেকেই পরলোক বাদী নহি কি? মৃত্যুর পর-পারেও কি আমরা জীবন-লীলার কল্পনা করি না? পরিদৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই বিজ্ঞান, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অখণ্ড নিয়মাবলীর রাজত্ব ঘোষণা করেন। ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে সৌরজগৎস্থিত অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমস্তই নিয়মাধীন। প্রশ্ন এই,—'আমাদের এই পরলোকে বিশ্বাস বিজ্ঞানুমোদিত কি না? এই দেহের অবসানে, অথবা যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহার পরে 'আমরা' বা আমাদের 'ব্যক্তিত্ব' (personality) থাকিবে কি না? অথবা থাকা সম্ভব কি না?" কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, কাহারও পারলৌকিক বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ, অথবা সেই বিশ্বাসের মূলকে শিথিল করিবার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যে বিশ্বাসে মানব অশেষ শান্তি লাভ করে, যে বিশ্বাসে এই রোগ-শোক-সমাকুল, বিচ্ছেদ বিরহ-বহুল, অতৃপ্ত জীবন-ভার

সহনীয় হয়, সেই বিশ্বাসকে শিথিল করা কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

তবে বিজ্ঞান অনেক সময়েই অতি নির্ম্মম ও কঠোর; প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার সর্ব্বদাই বিজ্ঞানকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইতেছে। যুক্তি ও তর্কের পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ; বিশ্বাস ও সংস্কারের পথের ন্যায় ইহা সুগম নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তি যুক্তি ও তর্ককে উপেক্ষা করিতে এবং বিজ্ঞানালোককে দূরে রাখিতে পারেন না। এই যুক্তি, তর্ক ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের পারলৌকিক বিশ্বাসটাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? যদি তাহারা আমাদের চির-পোষিত, অশেষ শান্তিপ্রদ বিশ্বাসকে মূলহীন করে, তথাপি আমরা সেই বিশ্বাসকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিলে, আমাদের ভয়ের, আশঙ্কার বা উদ্বেগের কোনও কারণই নাই। অন্ধ বিশ্বাসে শান্তি পাইলে, তাহাই বা ছাড়িব কেন?

মানব-জীবনকে আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি; একটা দৈহিক, অপরটা মানসিক বা 'আত্মিক'। 'মানসিক' কথাটা ঠিক হিন্দু দর্শন-সম্মত না হইতে পারে; কারণ 'মন' একটা ইন্দ্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যাত ও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক জড়বাদী, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। যদিও তাঁহারা যুক্তিমার্গেই এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন তথাপি আমরা সেই শ্রেণীর চার্ব্বাক্-মতের অনুগামী হইতে চাহি না।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ!" ইত্যাদি

এই মতাবলম্বী হইলে আর আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। দেহাতিরিক্ত 'আত্মার' অথবা 'মনোজগতের' অনুভূতি প্রত্যক্ষ; সুতরাং, মন বা আত্মার অস্তিত্বে কেহই সন্দিহান নহেন। মন ও দেহের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তথাপি ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, দেহ ও আত্মা বিভিন্ন; ইহার স্বরূপ, ধর্ম্ম ও প্রকৃতি ঠিক্ এক রকমের নয়। জড়োপহিত চৈতন্যই জীব; সুতরাং, জড় ও চৈতন্যের বিভেদের উপরই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়বাদীদিগের মতসমূহের আলোচনা না করিলেও, হিন্দু-দর্শনেই আমরা বহু মতের সমবায় দেখিতে পাইব। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার 'শারীরক ভাষ্যে' সাধারণতঃ এই কয়েকটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

"দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনাঃ লোকায়িত-কাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেত্যপরে। মন ইত্যন্যে। বিজ্ঞান-মাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে। শূন্যমিত্যপরে। অস্তি দেহাদি-ব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তেত্যপরে। ভোক্তৈব কেবলং ন কর্ত্তেত্যেকে। অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি কেচিৎ। আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে, এবং বহবো বিপ্রতিপন্না যুক্তিবাক্যতদাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্তঃ।"

অশাস্ত্রজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিরাও লোকায়তিকেরা দেহমাত্রকে চৈতন্য-বিশিষ্ট আত্মা মনে করে; কেহ কেহ চেতন ইন্দ্রিয়সমূহকেই আত্মা বলে; অপরে মনও বলে; যাহা কিছু জানি তাহা ক্ষণকালের জন্য। শূন্য ভিন্ন কিছুই নাই ও জানি না। দেহ ছাড়া, সংসারলিপ্ত কর্ত্তা, ভোক্তা, আত্মা, ইহাও কেহ কেহ বলেন; আবার কেহ বলেন, তিনি কেবল ভোক্তা, কর্ত্তা নহেন। কেহ বা দেহ ছাড়া সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই আত্মা বলেন; ভোগের জন্যই আত্মা, ইত্যাদি বহু মত প্রচলিত আছে।

দেহ ক্ষণভঙ্গুর, দেহ নশ্বর, দেহ মরণশীল, ইহা ত সকলেই স্বীকার করেন। শৈশব হইতে বাল্য, বাল্য হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবন. মানবজীবনের এই সমস্ত অংশেই দেহের উন্নতি, বৃদ্ধি ও পরিণতি; প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিলেই দেহের অবনতি ও ক্ষয়ের আরম্ভ হয়। মাংশপেশী, স্নায়ু, সমস্তই দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করে; অস্থি প্রভৃতি ভঙ্গুর (brittle) হইতে থাকে; শুক্র-শোণিত প্রভৃতির অভাব ঘটিতে থাকে; ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়ে; নয়নের দর্শনশক্তির হ্রাস হয়; সমস্ত দেহব্যাপী স্পর্শানুভূতির ক্রমশঃ বিলোপ হইতে থাকে; কর্ণ ক্রমশঃ বধির হইয়া উঠে; নাসিকার ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস হয়। দেহ, বার্দ্ধক্যসমাগমে সর্ব্বতোভাবে ধ্বংসোন্মুখ; তারপরেই মৃত্যু। দেহ সম্বন্ধে. মৃত্যুর অর্থ,—শারীরক্রিয়ার নিবৃত্তি। শারীর উপাদান-সমূহের বিকৃতি, অথবা হিন্দুদর্শনের ভাষায় 'ভূতে লয়'। বিজ্ঞানের পক্ষে, জড়ের মূল উপাদান অবিনশ্বর হইলেও, যে সমস্ত অণু-

পরমাণুর সহযোগে দেহের উৎপত্তি, তাহার বিয়োগ বা বিশ্লেষণেই দেহের বিনাশ। আমার দেহ, পঞ্চভূতে বা তদতিরিক্ত মূল পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলে, আর আমার দেহ বলিয়া কেহই সেই ভূতগণকে কি মূল পদার্থকে দাবী করিবেন না।

সুতরাং, মানবের দৈহিক জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ও সর্ব্ববাদিসম্মত ; এ বিষয়ে বিশেষ কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। শরীর ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়াই আমরা মানব-জীবনের এই ভাগের উপাখ্যান শেষ করিতে পারি।

তবে কেহ কেহ স্থূল দেহের অভাবে সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। এই সূক্ষ্মদেহ যে ঠিক কি, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। উহা কি জড় পদার্থ, না জড়াতিরিক্ত কিছু? কেহ উহাকে দেহেরই প্রতিকৃতিস্বরূপ বলিয়া মনে করেন—অর্থাৎ, ছায়া যেমন অনেক পরিমাণে প্রকৃত পদার্থের অবয়ব ধারণ করে, ইহাও তাহাই। তবে এই তথাকথিত সূক্ষ্মদেহের দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না ; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ের আলোচনা করিব না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম দেহকে কেহই 'জড় দেহ' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

জড়ের ত পরিণাম দেখিলাম—দেহের ত অবসান হইল। এখন মানবজীবনের দ্বিতীয় বা অপর ভাগের আলোচনা করা যাউক। যাহাকে আমরা আত্মিক বা মানসিক জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই জীবনও কি দৈহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়? এইটিই সমস্যা। এখানেই নানাপ্রকার বিশ্বাস ও

সংস্কারের লীলা দেখা যাইবে; পরলোকবাদের মূলভিত্তি এইখানে। সর্ব্বদাই দেহের বিনাশ দেখিতে পাইতেছি; সুতরাং দেহাবয়ব-বিশিষ্ট মানবের এবংবিধ পারলৌকিক জীবন অসম্ভব বলিয়াই সকলে মনে করেন।

যেমন দেহাবয়ব-বিশিষ্ট মানব এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, তেমনই মৃত্যুর পরে মানব, দেহ লইয়া জগদন্তরে লব্ধপ্রবেশ হয়, ইহা কেহই বলেন না। দেহ ভস্মীভূত হইতেছে অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে; মাংশাশী পশু-পক্ষীর উদরসাৎ হইতেছে, কিংবা পচন-পাচন ক্রিয়ায় পঞ্চভূতে লীন হইতেছে। 'জন্মান্তর-বাদ'ও অনেকটা বিজ্ঞানের ও যুক্তির সীমার বাহিরে। প্রশ্ন এই,—দেহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কি 'আত্মিক' বা মানসিক জীবনেরও লয় ঘটে? না, দেহাতিরিক্ত 'আত্মা,' 'জীবাত্মা,' 'সূক্ষ্মদেহ' বা 'মানসিক জীবন' মৃত্যুর পরেও নিরালম্বভাবে অবস্থিতি করে? পরলোকবাদীরা বলেন যে, দেহ পঞ্চ ভূতে বিলীন হইলেও মানবাত্মার বিনাশ হয় না; মানবের ব্যক্তিত্ব (personality) রহিয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে প্রমাণ কি? ভূয়োদর্শন, তর্ক ও যুক্তিমার্গে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই? বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পরম্পরায় কি মৃত্যুর পরে 'জীবাত্মা'র অবস্থান ও অস্তিত্ব অনুমিত হয়? প্রেতাত্মার সহিত আলাপন, সূক্ষ্মদেহের আকস্মিক দর্শন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যদিও প্রাচীনকাল হইতে বহু কিংবদন্তী শোনা যাইতেছে, কিন্তু তাহা অদ্যাপি যুক্তি ও তর্কের বিষয় হইতে পারে নাই। ব্যক্তি-বিশেষের ভাগ্যে এই প্রকার

দর্শন ও আলাপন ঘটিলেও, জন-সাধারণের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং, সেই সমস্ত বিষয়ও বিজ্ঞানের কি যুক্তির বিষয়ীভূত হয় নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনায় নিরস্ত থাকিলাম।

দেখা যাউক যে, যাহাকে আমরা মানসিক বা আত্মিক জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি সেই জীবনের অবস্থা, কার্য্য ও প্রণালী ইত্যাদি আলোচনা দ্বারা আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কোনও তত্ত্ব বা সদুত্তর উদ্‌ঘাটিত বা স্পষ্টীকৃত হয় কি না? শিশুকাল হইতে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করি; সুখ ও দুঃখ, বেদনা ও তৃপ্তি অনুভব করি। স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধির উন্মেষ হয়, যৌবনে কতই জ্ঞান সঞ্চয় করি, কত প্রকার উদ্দাম কল্পনা-জল্পনায় প্রাণ ভরিয়া যায়, শোভা ও সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগিয়া উঠে, ললিত-কলার অনুশীলনে মন প্রধাবিত হয়, —কতই প্রচ্ছন্ন মানসিক শক্তি জাগিয়া উঠে। মানবাত্মার এই সমস্ত অভাবনীয় ক্রম-বিকাশশীল শক্তি ও অবস্থা দেখিয়া, জড়বাদকে— অর্থাৎ, অণু-পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগে, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণে, সমবায়-অসমবায়েই মনোরাজ্যের অদ্ভুত শক্তি ও ঘটনাবলীর সংঘটন হয়, এই ধারণা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়। আত্মার স্বরূপ চিন্তা করিলে আর ইহাকে জড়ের পরিণাম বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। তবে কেহ মনে করিবেন না যে, জড়বাদী বিবুধমণ্ডলীর মত খণ্ডন করাই আমার উদ্দেশ্য। সময়ান্তরে ইহার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য

এই যে, মানবের দৈহিক শক্তিসমূহ যেমন বার্দ্ধক্যারম্ভে ক্রমশঃ ধ্বংসের বা লোপের দিকে চলিতে থাকে, মানবাত্মার মানসিক শক্তিনিচয়েরও কি সেই দশা ?

বৃদ্ধের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই ? বার্দ্ধক্যে মনঃশক্তিসমূহ পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বয়োবৃদ্ধ যিনি, তিনি স্বতঃই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, দূরদর্শী, সতর্ক, সংযত-চিত্ত, পরিপক্কবুদ্ধি। চলনে, কার্য্যে ও চিন্তায় সংযত ; মনের বা দেহের ক্ষিপ্রগামিত্ব বা ক্ষিপ্রকারিতা আর নাই ; তাঁহার কল্পনা আর সে প্রকার প্রোজ্জ্বল বা উদ্দাম নয় ; তাঁহার শক্তিরও আর সে প্রকার ক্ষিপ্রকারিতা নাই। বর্ত্তমানের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ অনুরাগ নাই ; নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই ; নূতন ভাবের নূতন কার্য্যে আর কোনও সহানুভূতি নাই। সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি বা কোনও ব্যাপারেই অভিনব সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের দিকে তাঁহার আসক্তি নাই। যুবকগণের নূতন ক্রিয়াকলাপের দিকে বা অভিনব সংস্কারের দিকে তাঁহার কোনও সহানুভূতি নাই, তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তন-বিরোধী ও রক্ষণশীল। অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনও তাঁহার নিকট বিপ্লব বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমানে অনাস্থা, নূতনে বিরক্তি, পরিবর্ত্তনে আপত্তি, এই সমুদয়ই বার্দ্ধক্যের লক্ষণ। সেই জন্যই নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈব বিচারে তু ভোজনেপ্যপ্রবর্ত্তনম্ ॥

কিন্তু এই যে অনাস্থা, এই যে বিরক্তি, এবং এই যে আপত্তি, ইহার কারণ কি? অভিনব বিষয় গ্রহণ করিবার ক্ষমতার ক্রমিক বিলোপ। উদ্ধৃত শ্লোকে আপৎকালে বৃদ্ধের বচন গ্রহণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু যাহাকে আমরা কর্ম্ম (action) বলি, তাহাতেও বৃদ্ধের নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। বর্ত্তমান অভিনব বা আকস্মিক কোনও ভাব বা মত গ্রহণ করিবার অক্ষমতাই মানসিক শক্তি ও ক্ষমতালোপের সূচনা করে। জড়বাদীর ভাষায়, মস্তিষ্কের এবং অনেকের মতে, মনের এই ভাব-গ্রহণের অক্ষমতা হইতেই ক্রমশঃ স্মৃতি-ভ্রংশের আরম্ভ হয়; স্মৃতি-ভ্রংশ হইতে বুদ্ধি-নাশ, এবং গীতার মতে—তাহার পরেই মৃত্যু, "সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রমাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

যাহাকে আমাদের দেশে 'ভীমরথি' হওয়া বা 'পাওয়া' বলে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কি যে আশ্চর্য্যরূপে স্মৃতিনাশ ঘটে, তাহা অবর্ণনীয়! এই মাত্র আহার শেষ হইল, পরক্ষণেই আর সে আহারের কথা মনে নাই; প্রভাতকালে যাহা ঘটে মধ্যাহ্নে আর তাহার স্মৃতি থাকে না; মধ্যাহ্নে যাহা করা হইল, অপরাহ্নে তাহা একেবারে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমগ্ন। বার্দ্ধক্য, ইংরেজীতে Second childhood অথবা দ্বিতীয় শৈশব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু, শৈশবে আর বার্দ্ধকে অনেক পার্থক্য। শৈশব বিকাশোন্মুখ, উন্নতিপন্থী; বার্দ্ধক্য ধ্বংসানুরাগী ও অবনতি-মার্গাবলম্বী। আর, এই স্মৃতি-ভ্রংশের একটি ক্রমও পরিলক্ষিত হইবে। যথা,—

প্রথমতঃ—কিয়ৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। প্রভাতে আহারের কথা অপরাহ্নে স্মরণ থাকে না; কিন্তু 'ভীমরথি'র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার স্মৃতি অনেক সময়ে উজ্জ্বল থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয় ক্রম,—নামের ভুল (Proper names) ইহা আমরা নিজ জীবনেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, বা করিয়াছি। ব্যক্তি,দ্রব্য, দেশ প্রভৃতির নাম মনে পড়ে না, অনেকে ইহাকে শেষের বা অন্তিমের প্রারম্ভ—The beginning of the end বলিয়া মনে করেন। ইহাকে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (Nervous debility) বা যাহাই বলুন, ইহা স্মৃতিনাশেরই প্রারম্ভ। বিশেষ নামের পরে, সাধারণ নামের ভুল। (Proper names এর পরে Common names); তারপরে বিশেষণ।—অর্থাৎ, প্রথমে বিশেষ্যের অস্মৃতি, পরে বিশেষণের, বিশেষণের পরে ক্রিয়া-পদের ও সর্ব্ব-নামের, তৎপরে অন্যান্য বিষয়ের। আর একটি নিয়ম, নূতনের বিস্মৃতি পুরাতনের পূর্ব্বে, জটিলের বিস্মৃতি সরলের পূর্ব্বে, স্বেচ্ছা-সম্ভব ক্রিয়ার বিস্মৃতি ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়ার পূর্ব্বে। (From the new to the old, from the complex to the simple, from the voluntary to the automatic, from the best-organised to the least-organised.) এই স্মৃতি-ভ্রম হইতেই বুদ্ধি বা বিচারণার ভ্রম হইতে আরম্ভ হয়, তৎপরে সদসৎ-বিবেকেরও বিলোপ ঘটে। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিনাশ সংসাধিত হয়। এ বিষয়ের বহু দৃষ্টান্তের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দেখা

যাইতেছে যে, বার্দ্ধক্যাগমে কেবল যে দৈহিক অবনতিই ঘটে, তাহা নয়; মানসিক অবনতিও অপরিহার্য্য। তাহাই যদি হইল, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের 'আত্মিক' বা 'মানসিক' জীবনও ধ্বংসানুগ। দেহের ত বিনাশ হয়ই; দেহের কিছুই থাকে না। আমাদের আত্মিক বা মানসিক জীবনের যতই বড়াই করি না কেন, দেখিতে পাইতেছি— তাহাও ধ্বংসানুগ। তবে তাহারই বা বিনাশ হইবে না কেন? শরীর-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি মানসিক বা আত্মিক বৃত্তি ও ক্ষমতাসমূহের অপচয় ঘটে, তবে একের ধ্বংসে অপরের ধ্বংসের অনুমান বা সিদ্ধান্ত কি অযৌক্তিক বা তর্ক ও ন্যায়-শাস্ত্রের বিরোধী? দেহ মূল-পদার্থে বা ভূতে, অণু বা পরমাণুতে পরিণত হইল; আত্মা বা জীবাত্মা সেই ব্রহ্মপদার্থে পরিণত হইল;—এই প্রকার মনে করা কি বিজ্ঞান বা দর্শনের বিরোধী? কিন্তু, দেহ, মূল পদার্থে বা ভূতে পরিণত হইলে, আর ত সে দেহের বিশেষত্ব কিছু রহিল না; তেমনই যদি জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইল, তখন আর জীবাত্মার জীবত্ব কোথায়? বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত, নিমজ্জিত ও একীভূত হইল। তখন আর ব্যক্তিত্ব (Personality) কোথায় রহিল? এই ব্যক্তিত্ব-বিলোপের ভয়েই কি জগতে নানা প্রকার পারলৌকিক বিশ্বাসের উদ্ভব হয় নাই?

টিচ্‌নারের (Titchner) মতে, যাহাকে আমরা আত্মা বলি, তাহা এই প্রকারে সংজ্ঞিত হইতে পারে,—"Mind is the sum-total of mental processes, experienced between

limits of childhood and senility."—বাল্য ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে যে সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, তাহার সমষ্টিকে মন বা আত্মা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই ত এই আত্মিক জীবনের আরম্ভ ও শেষ পরিলক্ষিত হইতেছে! ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন বা আবির্ভাব কেহ সাধারণতঃ দেখে নাই। দেহের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলেও তাহা নশ্বর বলিয়াই বিবেচিত হয়। দেহের অবসানে 'আত্মার' আবির্ভাব কি কেহ অনুভব করিয়াছেন? প্রায় সকলেই তাহা করেন না, এবং আত্মার স্বরূপের আলোচনা করিয়া তাহা ধ্বংসানুগামী বলিয়াই বিবেচিত হয়। মৃত্যুর কথা ভাবিলে দেহে ও মনে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় না। যে ভূয়োদর্শন, যুক্তি, বা তর্কের পথে আমরা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেই পথেই আমরা সম্যক্ মানব-জীবনের (দৈহিক ও মানসিক) উভয়বিধ বিনাশ অনুমান করিতে পারি।

তবে মৃত্যুর পরেও যে ছায়াদর্শন, সূক্ষ্ম দেহের আবির্ভাব, ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে অবস্থাবিশেষে প্রেতাত্মার সমাগম প্রভৃতির কথা বহু প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি—সে সমস্ত কি? এই সমস্ত দর্শন যদি সকলের ভাগ্যেই ঘটিত, তবে যে প্রশ্নের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সর্ব্বতোভাবেই অনাবশ্যক হইত। প্রত্যক্ষের উপরে প্রমাণ নাই বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু, এই ছায়াদর্শন, প্রেতাত্মার আবির্ভাব প্রভৃতিও বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় এখন পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। কেহ

কেহ এই সমস্ত ব্যাপারকে 'উষ্ণ মস্তিষ্কের কার্য্য' অথবা কল্পনার ও স্বপ্নের লীলা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। There may be more things in heaven and earth than are dreamt of in our Philosophy.—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অতীত অনেক বিষয় থাকিতে পারে বা আছে। কিন্তু তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। জ্ঞানের রাজ্য ছাড়িয়া বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করিলে, অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব, কল্পনাতীত, বিস্ময়কর ব্যাপার পরিদৃশ্যমান হইতে পারে। সেই অপূর্ব্ব রাজ্যের ব্যাপার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

আমরা সমস্ত জীব জগতে দুইটি ভাব বা স্বভাবজাতা প্রবৃত্তির বা সহজাত সংস্কারের ক্রিয়া (Instincts) সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। ইহাকে আত্ম-রক্ষা, আত্ম-প্রীতি, এবং সন্ততি-রক্ষা বা অপত্যস্নেহ (Self-preservation and Species preservation) বলা যাইতে পারে। এই দুই প্রবৃত্তির তাড়নাতেই জীব, জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এবং জীবপ্রবাহ এই বিশ্বে বহমান রহিয়াছে। মৃত্যুর সহিত অহর্নিশি সংগ্রাম চলিতেছে, এবং এই সংগ্রামই জীবন। যুদ্ধে পরাভূত হইলেই মৃত্যু। বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, দেহের এই মাংস, পেশী, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, শোণিত, সমস্ত উপাদানই পৃথক্ ও যৌথভাবে আত্ম-রক্ষা করিতেছে। আত্ম-রক্ষা-কল্পে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে পর্য্যুদস্ত হইলেই দেহের অবসান বা মৃত্যু ঘটিতে আরম্ভ হয়। মানসিক জগতেও সেই একই নিয়ম। এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বা আত্ম-প্রীতি জীবনের

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানবকে পরিত্যাগ করে না। কাহারও মরিতে সাধ হয় কি ? সংসার বহু দুঃখের আগার, মানবজীবন শোক-দুঃখ-সমাকুল, জীবনে সুখের বা উপভোগের কিছুই নাই,—এই মতাবলম্বীরা মুখে যাহাই বলুন, কখনও আত্মহত্যায় লিপ্ত হন না।

ভারতীয় 'অমঙ্গল'-বাদী বৌদ্ধ-দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া জর্ম্মণ-দেশীয় অশুভ-বাদী দর্শনেও জীবনের প্রতি কতই বিরাগ, সংসারের প্রতি কতই বিতৃষ্ণা প্রদর্শিত হইয়াছে! বলিতে কি, কোনও কোনও পণ্ডিত, মনুষ্যমাত্রকেই আত্মহত্যা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, অদ্য পর্য্যন্তও সে উপদেশ কেহই গ্রহণ করেন নাই, এবং এই প্রকার সদুপদেষ্টাকেও কখনও আত্মহত্যা করিতে দেখি নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, আত্ম-রক্ষা, আত্ম-প্রীতি, বা জীবন-রক্ষার চেষ্টা বা ইচ্ছা, প্রবল নৈসর্গিক প্রবৃত্তি। মুমূর্ষু ব্যক্তিও মরিতে চায় না ; অন্ধ, বধির, পঙ্গু, বৃদ্ধও জীবনটাকে বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত করিতে চায় না ; জীবনের প্রতি এতই মমতা !

মৃত্যুর পরপারে এই মমতাটাকে প্রসৃত করিলেই পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করিতে হয়। এই জীবন-রক্ষার প্রবৃত্তি, জীবনে এই আসক্তি ও মমতাই পরলোক-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি কি না, তাহা "সুধীভির্ভাব্যম্"। দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, শ্রাব্য হইতে অশ্রাব্যে, অনুভূত বিষয় হইতে অননুভূতে উপনীত হওয়াই যুক্তি ও ন্যায়।

যাহা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ করিতেছি, অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে কি অদৃষ্ট, অপ্রত্যক্ষ, অননুভূত পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারি?

কেহ কেহ বলেন যে, এই জীবনের অসীম ও অনন্ত আকাঙ্ক্ষা হইতেও পরলোকে অনন্ত জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হওয়া যায়। কিন্তু, যাহা জরামরণশীল, তাহা হইতে কি অনন্তের ও অমৃতের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়? বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই প্রকার বিশ্বাসও বিজ্ঞানবিরোধী। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিপরম্পরায় আমরা পরলোকের অথবা মৃত্যুর পরে আমাদের এই কাম-ক্রোধাদি রিপু-সঙ্কুল, সুখ-দুঃখ সমাকুল, আশা-নিরাশা-সন্তাড়িত, স্নেহ-স্নিগ্ধ ও পাপ পরিপূর্ণ আত্মিক বা মানসিক জীবনের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তর্কই মানবাত্মার একমাত্র অবলম্বনীয় নহে। মানবের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলে অন্যান্য অনেক প্রকার পন্থা দেখিতে পাওয়া যায়। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর,"—এ কথাটা ত আর মিথ্যা নয়! ভক্তি-মার্গে যাহা লাভ করা যায়, তাহা জ্ঞান-মার্গাবলম্বীর পক্ষে দুর্ল্লভ। আর, ব্যক্তিত্বের বিনাশেই বা আমরা এত ভীত হইব কেন? যাঁহারা মোক্ষপথাবলম্বী, তাঁহারা ত এই ব্যক্তিত্বের বিনাশ করিয়াই নির্ব্বাণ লাভ করিতে চান? সুতরাং, মানব-জীবনের ধ্বংসে বা মানবাত্মার লয়ে কোনও হিন্দুই ব্যথিত হইবেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যদিও অনেকে হিন্দু-দর্শনের

মতাবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্রভোগ-বিরাগ, শমদমাদি-সাধন-সম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব-লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করিলে বিষম বিপদে পড়িয়া থাকেন। আপনারা জর্ম্মণ দার্শনিক সপেনহুঁয়ের নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন। তাঁহার দর্শন, আমাদের হিন্দু-দর্শনেরই অনুরূপ। এক বিদুষী মহিলা তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বামীর বিয়োগ ঘটে, তিনি শোকে অধীরা হইয়া পড়েন; পরে আচার্য্য সপেনহুঁয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "হে গুরুদেব, আপনি শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই রোগ-শোক-সমাকুল জীবনের অবসানই বাঞ্ছনীয়; আপনি শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই জীবনের অবসানে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে; আমরা সেই অনন্ত, অব্যয়, অক্ষয়, ব্রহ্ম-পদার্থে লীন হইব। সে শিক্ষায় ত আমি শান্তি পাই না! আমি চাই, যেন আমার দেহাবসানেও সেই প্রেম-পরিপূর্ণ স্বামীর সঙ্গ লাভ করিতে পারি,—নির্ব্বাণ চাহি না।"

পাশ্চাত্য জগতের ভোগ-লিপ্সুগণের এই আকাঙ্ক্ষা, এই তৃষ্ণা, স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা প্রাচ্য হিন্দু, ভোগ-বিতৃষ্ণ, আমরা এই নির্ব্বাণে ব্যথিত হইব কেন? ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা আমরা ভুলিব কেন? আমরা আমাদের তত্ত্ব-বিদ্যা পরিত্যাগ করিব কেন? আমরা জানি, এই ব্যবহারিক বা লৌকিক জ্ঞানের অন্তরালে, সেই নিত্য, শুভ্র, বিমল পারমার্থিক জ্ঞান অধিষ্ঠিত আছে। আমরা তাহারই অনুসরণ করিব। এই ব্যবহারিক পরলোক-জিজ্ঞাসানন্তর 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। আমি সেই ব্রহ্ম-সূত্রের প্রথমসূত্রের উল্লেখ

করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। আশা করি, আপনারাও সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া জীবন-প্রহেলিকার সমাধান করিবেন।—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—যেন সময়ান্তরে সেই ব্রহ্ম-তত্ত্বের আলোচনা করিতে পারি।

পরলোক

দ্বিতীয় প্রস্তাব

জড়-বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে পরলোকতত্ত্বের বা পরলোকবাদের মীমাংসার প্রয়াস ব্যর্থ এবং অনেক সময়ে বাতুলতা বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ইন্দ্রিয়-জন্য অনুভূতি বা যাহাকে সাধারণতঃ আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বহিরিন্দ্রিয়জজ্ঞান (Precep-tion) বলিয়া থাকি, তাহা পরলোক সম্বন্ধে সম্ভাবিত নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহা কদাপি ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। জড়-দেহের অবসানে, জড়রূপী সূক্ষ্মদেহের দর্শন যদি নিত্য-প্রত্যক্ষই হইত বা সকলের ভাগ্যেই ঘটিত, তবে আর এ আলোচনার প্রয়োজন থাকিত না। পরন্তু তথা-কথিত সূক্ষ্মদেহের দর্শন অনেক সময়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্তি-মূলক ও কল্পনা বিজৃম্ভিত (Illusion) মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে।

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইতেই অনুমানের উৎপত্তি, অথবা অনুমান সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ-মূলক। সুতরাং জড় ও মনোবিজ্ঞানানুমোদিত এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপী দ্বিবিধ পন্থাই, পরলোক-তত্ত্বরূপী চরম-সত্য নির্ণয় পক্ষে অনবলম্বনীয়। তজ্জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া"

অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না অথবা চরম সত্য নির্ণীত হয় না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

তবে উপায়? অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারেরা এই সমস্ত তত্ত্ব বা চরম সত্যনির্ণয়ে (Eternal verities or ultimate realities) আপ্ত বা ঋষি বাক্যকেই একমাত্র উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রদীপ্ত যুগে অনেকেই আপ্ত বা ঋষি বাক্যে ততদূর শ্রদ্ধাবান্ নহেন। শ্রুতি-বাক্য ও উপপত্তি দ্বারা মনন করিতে হইবে।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।"

আপ্ত বাক্য ও যুক্তিদ্বারা মনন করিতে হইবে। এই যুক্তি কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান নহে। যাহাকে সাধারণ ভাষায় অন্তর্দ্দৃষ্টি বা দার্শনিকের ভাষায় "আত্ম-জ্ঞান," বলে তাহাই যুক্তি।

প্রবন্ধান্তরে পরলোক-বাদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের, জড়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ভেদ হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিলে, তর্ক-মার্গে শূন্য-বাদে ও সংশয়-বাদে (Nihilism or Agnosticism'এ) উপনীত হওয়া অনিবার্য্য। পারমার্থিক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় আত্ম-দর্শন। পরলোক তত্ত্ব একটি বিশেষ পারমার্থিক তত্ত্ব। আর যদি আমাদের এই পরমার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই না থাকিত, তবে আর নিত্য-প্রত্যক্ষ মৃত্যুর পরে কি ঘটে,

এ প্রশ্ন কখনও আলোচনার বিষয় হইত না। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—এই নাস্তিক্য-বুদ্ধিই ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান বলিয়া বিবেচিত হইত। পরলোক বাদ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ অনেকেই নাস্তিকতা-প্রতিপাদক বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং করিবার কারণও ছিল। সে প্রবন্ধে বিরোধ-সমন্বয়ের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। পারমার্থিক তত্ত্ব নির্ণয়ে, জড় ও মনোবিজ্ঞানের অক্ষমতা প্রদর্শনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। গীতার কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক :—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আত্মা, জন্ম-মৃত্যু রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীরের বিনাশে, আত্মার বিনাশ হয় না।

অন্যত্র—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যয়োঽমুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

ইহাকে শস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায় না। অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। জল ইহাকে ক্লেদন করিতে পারে না। বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহার ছেদন, দাহন, ক্লেদন, শোষণ কিছুই নাই। আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলে, আত্মীয় ও স্বজনবর্গের নিধন অনিবার্য্য, ইহা মনে করিয়া বীরকুলাগ্রগণ্য অর্জ্জুন, যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, মৃত্যু ও আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যানে, উদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল। দেখা যাউক এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন করিয়া আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের সংশয়ের নিরসন করিতে পারি কি না।

পরিদৃশ্যমান জগতের ও জাগতিক ঘটনানিচয়ের অন্তরালে বা পশ্চাতে, যে এক নিত্য সত্তা বিরাজ করিতেছে (The reality behind phenomenon or the noumenal world behind phenomenal or empirical) তাহা স্বীকার না করিলে সর্ব্বতোভাবে মায়া বা শূন্য-বাদে উপনীত হইতে হয়; এবং ইহাই দার্শনিক নাস্তিকতা। পরলোকে বা মৃত্যুর পরপারে আমরা কাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্যাকুল? যাহা চঞ্চল, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা ইন্দ্রিয়-জন্য, তাহাকেই কি অনন্তকাল স্থায়ী করিতে চাই? তাহাতেই কি আমাদের পরলোক-জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হইবে? পূর্ব্ব-লোকের আলোচনা না করিয়া আমরা পরলোকের আলোচনা কি প্রকারে করিতে পারি? মৃত্যুর পর মানবাত্মার কি দশা

ঘটে, এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে 'জন্মের' পূর্ব্বে মানবাত্মার কি অবস্থা ছিল, ইহা জিজ্ঞাসা করা কি অন্যায়? আর যে 'আত্মা'র আলোচনা করিতেছি তাহারই বা স্বরূপ কি? ইহা নির্ণয় না করিয়া ভবিষ্যতে কি অতীত কালে ইহার কি অবস্থা হইবে বা ছিল তাহা আলোচনা করা নিষ্ফল। গীতার ভাষায়—"অব্যক্তাদীনিভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" ভূতসমূহ আদিতে অব্যক্ত, শেষেও অব্যক্ত, কেবল মধ্যে ব্যক্ত; সুতরাং তজ্জন্য শোক কেন? এই বলিয়া সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার শেষ করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু, তাহা অসম্ভব। "If you philosophise, you philosophise ; if you don't philosophise, you philosophise,—at any rate you must philosophise." অন্তরঙ্গ ছাড়িয়া বহিরঙ্গে, সার ছাড়িয়া অসারে, নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যে, আমরা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারি না।

অপর দিকে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা কি কেবল পরিদৃশ্যমান্ জগতেই নিবদ্ধ? জড়-বিজ্ঞান কি কেবল প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত? না,—প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্তরালস্থ কোন পারমার্থিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাও বিজ্ঞানানুমোদিত? রসায়ন-বিজ্ঞানের কথাই ধরুন্। পরমাণুবাদটা কি? পরমাণু কি কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে? পরমাণু কি কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? যদি না-ই করিয়া থাকেন তবে পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কেন, আর এই কল্পিত পরমাণুবাদের

উপরে সমস্ত রসায়ন-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? যতই সংযোগ ও বিয়োগ, আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করি না কেন, পরমাণুরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ অনুভূতিই যদি একমাত্র জ্ঞানের উপায় বা দ্বার হইত, তবে আর বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বহিরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে জ্ঞান বলিতে হয় বলুন, ইহা কখনও বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান নহে। এই অর্থে মানব সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান-বাদী। পারমার্থিক তত্ত্ব-চিন্তাই মানবের বিশেষত্ব; এবং পর-লোক-জিজ্ঞাসাও সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারই একাংশ। অনিত্যের অন্তরালে যে নিত্য পদার্থ, পরিবর্ত্তনশীলের পশ্চাতে যাহা অপরি-বর্ত্তনীয়, দৃশ্যের অন্তরালে যাহা অদৃশ্য, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত। মৃত্যুরূপ যবনিকার অন্তরালে কোন্ অমৃত বিরাজমান? আমার 'আমিত্ব' কোথায়? বার্দ্ধক্য ও বাল্যের মধ্যে যে সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি বা শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করি—কেবল তাহাই কি 'আমি' বা আমার 'আত্মা', না, তদতিরিক্ত কিছু ও আমার এই 'আমিত্ব' বা আত্মা?

যদি সাধারণ ভাবে সেই অতিরিক্ত কিছুর প্রমাণ চান, তবে সম্মোহনের (Hypnotic or mesmeric) অবস্থার কথাই স্মরণ করুন। কত অভাবনীয় শক্তির উন্মেষ দেখিতে পাইবেন। নখচ্ছেদ্যা কোমল লতিকার ন্যায় দুর্ব্বলা রমণীকে, উন্মাদনার অবস্থায় (Hysteric condition'এ) কখন কখনও মত্ত মাতঙ্গের অপেক্ষাও বলশালিনী দেখিতে পাইবেন। সেই প্রকার

অবস্থায় বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত কত কথাই স্মৃতি-পথে জাগরূক হয় ; কাষ্ঠ-লোষ্ট্রসম কঠোর প্রাণেও কত কবিতা-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, কত মূক বাচাল হয়, কত পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। অপর দিকে দেখুন, অসভ্য নাগা, গারো, সাঁওতাল, ভীল, হটেণ্টট্, জুলু প্রভৃতিরাও মনুষ্য ; আবার, কালিদাস, ভবভূতি, শঙ্কর, জৈমিনি, আর্য্যভট্ট, খনা, সেক্ষপীয়র, মিল্টন, স্পেন্সার, ডারউইন, ফেরাডে, কেল্ভিন্, হিগেল্, কাণ্ট, ভিক্টর হুগো ও গেটেও মনুষ্য। ইহা দ্বারা কি সপ্রমাণ হইতেছে ? ইহা দ্বারা কি মানবাত্মার অপরিমেয়, অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি ও ক্ষমতা সূচিত হইতেছে না ? ইহা দ্বারা কি সাব্যস্ত করা যায় না যে, যে 'আমিত্ব' আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি, তাহার পশ্চাতে এক বিশাল, অননুভূত, অপ্রত্যক্ষ 'আমি' রহিয়াছে ? পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাকেই The Great Unconscious 'বিশাল অননুভবনীয় আত্মা' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সংশয়বাদী ও বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক হাক্সেলি, তাঁহার এক বক্তৃতায় (Romannes Lecture) এতৎসম্বন্ধে প্রাচ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন,—

"The earlier forms of Indian philosophy, agreed with those prevalent in our own times in supposing the existence of a permanent reality or "*Substance*" beneath the shifting series of phenomena whether of matter or of mind. The Substance of the

cosmos was "*Brahaman*" that of the individual man "*Atman*" and the latter was separated from the former only, if I may so speak, by its phenomenal envelope, by the casing of sensations, thoughts and desires, pleasures and pains which make up the illusive phantasmagoria of life."

তিনি বলিয়াছেন,—"এই পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য জড় ও মনোরাজ্যের দৃশ্য ঘটনাবলীর পশ্চাতে এক যে অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য পদার্থ আছে এতৎসম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান যুগের সিদ্ধান্ত ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ এক। এই বিশ্বের মূলে 'ব্রহ্ম' পদার্থ, এবং আমাদের এই ব্যক্তিত্বের মূলে 'আত্মন্'। এই ব্রহ্ম পদার্থ ও আত্মার অথবা এই জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভেদ সর্ব্বতোভাবে মায়িক, অর্থাৎ—সুখ ও দুঃখ, তৃষ্ণা ও কামনা প্রভৃতি উপাধি-জন্য"। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ", অন্যত্র—"অজমব্যয়ং আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে, ন পরমার্থতঃ, তস্মান্ন পরমার্থ সৎ দ্বৈতম্"।

অধ্যাপক হাক্সেলি, ভগবান্ শঙ্করের এই অদ্বৈত মত লক্ষ্য করিয়াই উল্লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পরোক্ষ ভাবে ভিন্ন, বিশেষভাবে দ্বৈতাদ্বৈত মতের আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; কেবল অনিত্যের অন্তরালে যে নিত্য পদার্থ বিরাজমান্, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন দেশীয় বিবুধমণ্ডলীর মত ও সিদ্ধান্তের প্রদর্শনই আচার্য্য হাক্সেলির বাক্যোদ্ধারের উদ্দেশ্য।

যদি স্থূলভাবে দেখা যায় তবে পরিবর্ত্তন ও অনিত্যতা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের লক্ষীভূত হয় না। শৈশবের 'আমি', বাল্যের 'আমি' নই; যুবা 'আমি', প্রৌঢ় 'আমি' নই; এবং বৃদ্ধ 'আমি' কিছুতেই শিশু যুবা বা প্রৌঢ় 'আমি' নই। এ কথা যে কেবল মন সম্বন্ধেই প্রযুজ্য তাহা মনে করিবেন না। যাঁহারা বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি (Photos) রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, দেহের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। বাল্যের আকৃতি ও বৃদ্ধের প্রতিকৃতিতে কত পার্থক্য,—একই ব্যক্তির ছবি বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মনের কথাই ধরুন্— কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! জীবনের নানা বিভাগ কেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই মানব মনের যে কত পরিবর্ত্তন হয় তাহাই বা কত বিস্ময়কর! এই মুহূর্ত্তে আপনি স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ, পর মুহূর্ত্তেই আপনি হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিমূর্ত্তি। কখনও আপনি দেব-ভাবানুপ্রাণিত, কখনও আপনি আসুর-ভাবে পরিপূর্ণ। আপনি ইহার কোন্‌টি? অবিরাম স্রোত; কিন্তু কিসের স্রোত তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ, সময় ও সুবিধা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছে না। তবে কি স্মৃতিই 'আমি'? না, স্মৃতিও ত 'আমার'!

কবি গিরীশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়।—

"জুড়াইতে চাই,—কোথায় জুড়াই?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই!
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

"কি খেলায় আমি খেলিবা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন!
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর?
অধীর, অধীর, যেমতি সমীর,
অবিরাম-গতি নিয়ত ধাই।"

আবার—

"জানিনা কেবা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায়?
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারি দিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায় হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই!

পুনরপি—

"কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হল!
প্রবাহের বারি বহিতে কি পারি?
যাই যাই কোথা? কুল কি নাই!
কর হে চেতন কে আছে চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন!"

এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে স্পেন্সারও সাক্ষ্য দিতেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় প্রদর্শনোপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন :—

"Common sense asserts the existence of a reality ; objective science proves that this reality cannot be what we think it ; subjective science shews why we cannot think of it, as it is, and yet are compelled to think of it as existing, etc. etc. We are obliged to regard every phenomenon as a manifestation of Some Power by which we are acted upon, etc. etc." অর্থাৎ :—

সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি যে, এক নিত্য সত্তা বিরাজ করিতেছে। আমরা যাহা মনন করি সেই সত্তা যে তাহা নয় এবং তদতিরিক্ত কিছু,—জড় বিজ্ঞান তাহাই প্রতিপাদন করে ; আর মনোবিজ্ঞান, সেই সত্তার পূর্ণস্বরূপ আমরা কেন ধারণা করিতে পারি না, অথবা তাহার অস্তিত্বে কেন বিশ্বাস করিতে বাধ্য তাহাই বলিয়া দেয়। যে শক্তি সর্ব্বদা আমাদের উপর ক্রিয়া করে, পরিদৃশ্যমান্ ও অনুভবনীয় প্রত্যেক ঘটনাই যে সেই শক্তির বিকাশ ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

আমাদের সমস্ত মানসিক ব্যাপার বা মনন-ক্রিয়া এক স্রোতস্বিনীর সহিত উপমিত হইতে পারে ; আর যে 'খাতে' সেই চির-চঞ্চলা, নিয়তগতি-শীলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা তাহাকে আমরা 'আত্মা' বলিতে পারি। সেই নিত্য সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন :—

"অজোঽনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

সেই আত্মা জন্ম-রহিত, নিত্য, ক্ষয়-রহিত; পুরাতন শরীর ধ্বংস হইলেও, আত্মা ধ্বংস প্রাপ্ত হন না। কারণ মৃত্যুই বা কি? পরিবর্ত্তন,—একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন বৈ ত নয়! কোনও পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন।—

"There is no Death,
What seems so is transition."

মৃত্যু নাই, যাহা মৃত্যু বলিয়া বোধ হয়, তাহা একটা পরিবর্ত্তন বৈ আর কিছু নয়। আমি এ স্থলে জন্মান্তরবাদের বা গীতোক্ত—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
"তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

প্রভৃতি মতের সমর্থন বা খণ্ডন করিতেছি না। পরিবর্ত্তন বা বির্বর্ত্তনই যাহার প্রকৃতি, মৃত্যুরূপ ভীষণ পরিবর্ত্তনে তাহার ধ্বংশের আশঙ্কা কোথায়? আমাদের এই যে ব্যবহারিক আমিত্ব বা Phenomenal or Empirical Ego, তাহা ত কতগুলি ক্ষণিক অনুভূতি ও পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। A mere flow of sensations, emotions, volitions and thoughts:- বেদনা, কামনা, চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ। জড়-দেহ কি?—অস্থি, উপাস্থি, মজ্জা, মেদ মাংস ইত্যাদি। এই সমস্তই, পদার্থ-বিজ্ঞানের মতে,—প্রাথমিক, Primordial – অণু-পরমাণুরই রাসায়নিক সমবায়। অর্থাৎ, মূল পদার্থ সেই এক 'পরমাণু'

বেশ কথা। আর এই বেদনা, চিন্তা, কামনা ইত্যাদির মূলে কি? জড়-বাদীরা সমস্তই জড়-পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগোৎপন্ন মনে করেন, এবং বার্কলি প্রমুখ দার্শনিকেরা সমস্তই মানসিক বা Ideal বলিয়া থাকেন। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই এ দিকে অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ—তাঁহাদের মতে, হয় সমস্তই জড়, না হয় সমস্তই আত্মা। কিন্তু, আমরা এই জড় ও অজড়ের বিভেদের উপরেই আমাদের পরলোক-জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করিয়াছি। দেহের ধ্বংসশীলতা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি নাই, কিন্তু জড়াতিরিক্ত 'আমিত্বে'র বিনাশ স্বীকার করিতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন। জড়-বিজ্ঞানের মতে—যদি জড়ই অবিনশ্বর হয়, তবে কি আমাদের 'আত্মা' নশ্বর ?

পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্পেন্সার এই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্য—'অবিসম্বাদিত' বলিয়াছেন। (The indestructibility of matter) জড়-পদার্থের অথবা পদার্থের অবিনশ্বরত্ব; (The continuity of motion) গতির নিত্যতা বা চির-প্রবাহ; (The persistence of force) শক্তির চির-স্থায়িত্ব।

জড়ের ধ্বংস নাই, গতির শেষ নাই, শক্তির সীমা নাই। তবে কি শেষ আছে 'আত্মা'র? যদি 'আত্মা' জড়েরই পরিণাম হয়, তাহা হইলেও ত এই মতে আত্মার ধ্বংস বা বিনাশ সাব্যস্ত হয় না!

আমাদের কোনও বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি অসম্ভব। যাহা আমাদের নিকট সাধারণতঃ অদৃশ্য, তাহাও অবস্থা বিশেষে দৃশ্য হয়,

যাহা অশ্রাব্য তাহাও শ্রাব্য হয়, যাহা অস্পৃশ্য তাহাও স্পৃশ্য হয়। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তিবলে, 'অদৃশ্য আলোক'ও আমাদের নয়নের গোচরীভূত করিয়াছেন, 'অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ'ও আমাদের শ্রবণের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। তাঁহার কৌশলে অস্বচ্ছ পদার্থও স্বচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, দ্রব্যের অশব্দ স্পন্দনও শ্রুতি-যোগ্য শব্দে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা ও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অসারতা বিশেষ ভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, অদৃশ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব কেন?

এস্থলে অধ্যাপক টেইট্ ও ষ্টুয়ার্টের 'অদৃশ্য জগৎ ও পরকাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা' "The future universe or physical speculations on a future state" নামধেয় গ্রন্থের সামান্য একটি অংশ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। সেই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"In fine, we do not hesitate to assert that the visible universe cannot comprehend the whole works of God, because it had its beginning in time, and will also come to an end. Perhaps, indeed, it forms only an infinitesimal portion of that stupendous whole, which is alone entitled to be called the universe."

অর্থাৎ, "শেষ কথা এই যে, ভগবানের সৃষ্টি, সম্যক দৃশ্য জগতে নিবদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, এই পরিদৃশ্যমান জগতের

আরম্ভ আছে, সুতরাং ইহার শেষও হইবে। হয়ত এই দৃশ্য জগৎ সেই বিশাল সমগ্রতা—যাহাকে আমরা বিশ্ব বলিয়া থাকি—তাহারই সামান্য অংশ মাত্র।" যাহার সম্যক ধারণা হয় না, তাহাই যদি অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় হয় (The unknown and the unknowable) তবে আমাদের কোন পদার্থের বা বিষয়ের জ্ঞানই হইতে পারে না। পরলোকের ও আত্মার সম্যক্ ধারণা না হইলেও, তাহার পারমার্থিক জ্ঞান আমাদের নিশ্চয় আছে। যাহার সম্যক্ ধারণা হয় তাহাও জ্ঞান, যাহার আভাসও চিদাকাশে সামান্য ভাবে প্রতিবিম্বিত হয় তাহাও জ্ঞান। (Both comprehension & apprehension come under the category of knowledge) আত্মা সম্বন্ধেও মর্হষি বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

"আভাস এবচ অতএব
চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।"

অর্থাৎ, জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে আত্মার সেইরূপ প্রতিবিম্ব হয়।

আত্মা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের মতেই স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। ভগবান্ শঙ্করের নিম্নোদ্ধৃত বাক্য লক্ষ্য করুন।—"অতএব ন প্রমাণাপেক্ষা। অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমাণাপেক্ষা চ নত্বাত্মনঃ। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষা সিদ্ধিঃ কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ, যস্য প্রমাতৃত্বং স এব আত্মা নিশ্চীয়তে।" ইহার সহিত ডেকার্টের

সুপ্রসিদ্ধ "*Cogit Ergo Sum*" সূত্রের তুলনা করিলেই আমার এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন।—

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তি লজ্জায়ৈ কেবলং যথা
ন বুদ্ধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী
অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদোঽবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ॥

অর্থাৎ—

"আমার জিহ্বা আছে কিনা, এই বাক্য প্রয়োগ যেমন লজ্জার কারণ হয়, বোধ-স্বরূপ 'আত্মা কি' তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না, ইহাও তদ্রূপ। আত্মার অস্তিত্ব বিবাদের বিষয় হইতে পারে না। যদি আপনার অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ বা তর্ক উপস্থিত হয়, তবে সেস্থলে প্রতিবাদী বা উত্তরদাতা কে হইবে ?"

সেই স্বতঃসিদ্ধ আত্মাই অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। ইহাই অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইহার আবার বিনাশ কি ? ইহার আবার ইহকাল ও পরকাল কি ? ইহার পক্ষে আবার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিভেদ কি ? ইহা দেশ ও কালের অতীত। এই 'আত্মার' পরকালের জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কারণ কি ? যাহা কালাতীত, তৎসম্বন্ধে কাল-বিভাগের—অর্থাৎ, ইহার পূর্ব্ব ও পরকালের প্রস্তাবনার আবশ্যক কি ? প্রকৃত প্রস্তাবে, দেহাবসানে আমাদের 'আত্মা'র আত্মিক জীবনের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য আমরা ব্যস্ত নই। আমরা চাই যে, আমাদের

এই "কামক্রোধাদি রিপু-সংকুল, সুখ ও দুঃখ-সমাকুল, আশা-নিরাশা-সন্তাড়িত, স্নেহ-সিঞ্চিত, শোক-বিদগ্ধ ও পাপ-পরিপূর্ণ" এই 'ব্যক্তিত্ব,' এ দেহাবসানেও রহিয়া যায়। এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পরিহরণীয়া। বাস্তবিক এই জীবন-রক্ষার প্রবৃত্তিই যে আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শন-বিরোধী পরলোক-বাদের প্রণোদিকা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নচেৎ, দুঃখ-নিবৃত্তি, সুখলাভ ও স্বরূপা-বাপ্তিই (Self-realisation) যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আর এই দুঃখের আগার নাম-রূপ ইত্যাদি উপাধি রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হই কেন?

আত্ম-জ্ঞান লাভেই পরলোক-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি।

অনাত্ম ও অনাত্মীয় পদার্থে 'আমি,' 'আমার' এই অভিমানই দুঃখের নিদান। জ্ঞানালোকে এই মিথ্যাভিমান দূরীকৃত হইলে দুঃখ-বীজ দগ্ধীভূত হয়, এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে।

আত্মানাত্মবিবেকের উন্মেষ ব্যতিরেকে এই পরলোক-জিজ্ঞাসার মীমাংসা কদাপি সম্ভাবিত নহে। 'আমি' পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনও আছি, এবং পরেও থাকিব। কবি বলিয়াছেন :—

"Our birth is but a sleep and a forgetting.
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar ;
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,

But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home."

(Wordsworth's "Imitations of immortality from recollections of early childhood.")

কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অনমুকরণীয় উদ্ধৃত কাব্যাংশের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যাহাকে 'জন্ম' বলি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিস্মৃতি' ও 'সুষুপ্তি'। আমাদের 'আত্মা' —জীবনাকাশের নক্ষত্র, বহু দূরদেশ হইতে আগত; কিন্তু, নগ্ন ভাবে ও তাহার পূর্ব্ব ভাব সমস্ত বিস্মৃত-ভাবে উদয় হয় না। ব্রহ্ম পদার্থে, যাহাতে আমাদের প্রকৃত অবস্থান, তাহা হইতে আমরা উজ্জ্বল মেঘমালার ন্যায় উদিত হই। কবিবর কল্পনা-নেত্রে যে বিশ্ব-বিমোহন সত্য দর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহারই দার্শনিক আলোচনা করিতেছি।

আমরা যে আত্মার 'অবিনশ্বরত্ব' বা দেহাবসানে পরলোকে অবস্থান প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহা 'জীব'; এবং সর্ব্বতোভাবে উপাধি-তন্ত্র। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করি তাহা প্রকৃত আত্মা নয়, তাহা উপাধি (দেহাদি) বশতঃ স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য 'দেহ যোগাৎ বা সোঽপি' সূত্রের ভাষ্যে এই কথাটি অতি প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।—

"কস্মাৎ পুনর্জীব পরমাত্মাংশ এব সংতিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? সোঽপি তু জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভাবো দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-বিষয়বেদনাদি যোগাদ্ ভবতি। অস্তি চাত্র চোপমা।

যথা চাগ্নের্দহন প্রকাশন সংপন্নস্যাপি অরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্য। অতোহনস্য এবেশ্বরাজ্জীবঃ সন্ দেহযোগাদ্ তিরোহিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি, তৎপুনস্তিরোহিতং সংপরমেশ্বরম্ অভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোঃ বিধূতধ্বান্তস্য তিমির তিরস্কৃতেব দৃক্‌শক্তিরৌষধ বীর্য্যাদ্ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কদাচিৎ আবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তুনাং। কুতঃ। ততোহি ঈশ্বরাদ্ধেতরস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বর-স্বরূপা-পরিজ্ঞানাদ্ বন্ধস্তৎস্বরূপ পরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ।"

অর্থাৎ—জীব যখন ব্রহ্মের অংশ তখন তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হয় কেন? উত্তর—দেহ-সম্বন্ধ বশতঃ; দেহ, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত ও যেমন কাষ্ঠগত বা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ অনিবার্য শক্তির তিরোভাব হয় তদ্রূপ। অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও দেহ-যোগবশতঃ অনীশ্বর হন্। যেমন তিমিররোগগ্রস্ত, নষ্ট-দৃষ্টি ব্যক্তির ঔষধের গুণে দৃষ্টি-শক্তি আবার ফিরিয়া আসে, আপন হইতে আসে না, সেই প্রকার তিরোহিত-শক্তি জীব, ব্রহ্মের অভিধ্যানে যত্নশীল হইয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিলে আপন নষ্ট-ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়। কারণ, ঈশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ মোক্ষ। ঈশ্বরের স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ এবং ঈশ্বর স্বরূপের জ্ঞানে মোক্ষ।

আত্মা সম্বন্ধে, আমার মতে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দর্শনেরই এই চরম সিদ্ধান্ত। তাই, পূর্ব্ব পরলোক-বাদ প্রবন্ধে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" সূত্রের উল্লেখ করিয়া শেষ করিয়াছিলাম।

এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাতেই পরলোক জিজ্ঞাসার পরিণতি,—ইহাতেই সেই জিজ্ঞাসার সমাধান।

আত্ম-জ্ঞান লাভ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন আর এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির চির-স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং পরলোক-জিজ্ঞাসারও মীমাংসা হয়। এই দেহাদি উপাধি-পরতন্ত্র হইয়াও আমরা—সময়ে সময়ে যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়,—ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগে বা জ্ঞানযোগেই হৌক্,—সেই অদৃশ্য রাজ্যের বংশী-ধ্বনি শুনিতে পাই।

আমরা এই মর-জগতে অবস্থান করিয়াও এবং সেই অকুল, অনন্ত সমুদ্রের সৈকতে, শিশুর ন্যায় ক্রীড়া-পরায়ণ হইয়াও সময়ে সময়ে সেই মহাম্বুধির দর্শন লাভ করি; এবং দূরে—বহুদূরে অম্বুরাশির গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাই। অথচ আমরা সর্ব্বদাই ধ্বংশ, ক্ষয় ও বিনাশের লীলা দেখিয়া কখন কখনও আত্ম-বিস্মৃত হই! তাই কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলিতেছেন।—

"But for these obstinate questionings
Of Sense and outward things,
Fallings from us, vanishings ;
&c. &c.
Hence in a season of calm weather,
Though inland far we be,
Our soul have sight of that immortal sea
Which brought us hither ;
Can in a moment travel thither,

And see the children sport upon the shore,
And hear the mighty waters rolling evermore"

উদ্ধৃত শ্লোকাংশ ভাষান্তরিত করিবার অক্ষমতা প্রযুক্তই ইংরেজী-অনভিজ্ঞ শ্রোতা ও পাঠকবর্গের জন্য উহার অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না। অথচ উদ্ধারের লোভও সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

যাহা অদৃশ্য তাহাই নিত্য। আর যাহা দৃশ্য তাহাই ক্ষণিক।—

"The things which are seen are temporal, but the things which are not seen are Eternal!" এই ত জীবন-প্রহেলিকা! এই দুরূহ প্রহেলিকার সমাধানেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। যদি কৃতকার্য্য না-ও হই তথাপি—

"স্নাতংতেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্ব্বাপি দত্তাবনিঃ

* * * *

যস্য ব্রহ্ম বিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ।"

পরিশেষে, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমি, পঞ্চদশীকারের নিম্নোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া এই দুরূহ প্রশ্নের সমালোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম।

"ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্নোতি, শোকংতরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দী ভবতি নান্যথা।"

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

"সত্যং শিবং সুন্দরম্
সচ্চিদানন্দমদ্বৈতম্"

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতির আবশ্যকতা কি? আত্মরক্ষার জন্য শোভন সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না। আর এই আত্ম-রক্ষা-তত্ত্বটি নিখিল-বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। জড়, উদ্ভিদ্ ও চেতন—সর্ব্বত্রই এই মূল তত্ত্বটি অব্যাহতরূপে ক্রিয়া করিতেছে। ইহার ক্রিয়ার মধ্যে সৌন্দর্য্য বা শোভার স্থান নাই। জীবন-সংগ্রামে হয় ত যাহা সুন্দর, যাহা শোভন, যাহা রম্য, তাহাও বিনষ্ট হইতেছে; আবার যাহা কুৎসিত ও কদাকার তাহা টিঁকিয়া যাইতেছে। অপর যে তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত নিসর্গব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন—অর্থাৎ 'বংশ ও সন্ততিরক্ষা' তাহাতেও সৌন্দর্য্যানুভূতির কোন স্থান আছে কি না, তাহাও কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

অনেক পণ্ডিতের মতে—যে 'যৌন-নির্ব্বাচন'-ভিত্তির উপরে এই বংশরক্ষা-তত্ত্বটি স্থাপিত, তাহাতে শোভানুভাবকতার স্থান বা প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে। পণ্ডিতবর ডার্‌উইনের

মতে উদ্ভিদে ও চেতনে, যৌন-নির্ব্বাচন প্রথার ('Sexual selection'এর) অনুসরণ অবিসংবাদী। উদ্ভিদে নব কিশলয় ও পুষ্পের শোভা, পত্র-পুষ্প ও ফলের হৃদয়োন্মাদক সুগন্ধ—এই যৌন নির্ব্বাচনের একটি প্রধানতম উপায়। আর জীবজগতের সৌন্দর্য্যের ও সৌন্দর্য্যানুভূতির মূলেও সেই যৌন নির্ব্বাচন। বিহগের মধুর কাকলী ও সঙ্গীত-ধারা, বিবিধ মনোমোহন নৃত্য-ভঙ্গী, অঙ্গের লাবণ্য, পুচ্ছ ও পালকের বিচিত্র বর্ণ-শোভা—এ সকলই যৌন-নির্ব্বাচন ও সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষার ফল। নিম্নজাতীয় পশু হইতে অত্যুচ্চ মানবের মধ্যেও শোভা ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ এই মূলতত্ত্ব-প্রসূত। ইহা হইতেই সর্ব্ববিধ ললিতকলা ও সুকুমার শিল্পের উৎপত্তি; স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, নৃত্য ও নাট্যকলা, সঙ্গীত ও কবিত্বের জন্ম।

বিবর্ত্তনবাদীদিগের মতে সৌন্দর্য্য ও সুকুমার শিল্পের অভিব্যক্তি ও বিকাশের ইহাই ক্রম। বিবর্ত্তনবাদী দার্শনিকপ্রবর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ললিতকলাসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি অভিনব মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে,—শিশুর ক্রীড়াশীলতাই বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ললিত-কলানুশীলনে পরিণত হইয়াছে। জীবন ধারণ ও রক্ষণের জন্য মানুষের যতটুকু শক্তি বা ক্ষমতার ('Energy'র) প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতা মানুষের আছে। সেই অতিরিক্ত শক্তি প্রায়শঃই ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যয়িত হয় এবং তাহা হইতেই ললিত-কলা জন্ম লাভ করে। পণ্ডিতবরের এই মত গ্রহণ করিয়া

আমরা সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের ('Aesthetics'এর) কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি কি না, আপনারা তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অভিব্যক্তি যাঁহারা সমর্থন করেন বা সমর্থন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও আলোচনার ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বটে। অপর দিকে যাঁহারা চৈতন্য হইতে এই নিখিল বিশ্বের ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত্তন দেখাইতে অভিলাষী, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অন্য প্রকারের। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র হইতে যে বিপুল বিবর্ত্তন-বাদ সংসিদ্ধ হইয়াছে, সেই মূল-সূত্রে বা সূত্র-লক্ষ্যীকৃত পদার্থেই তাঁহাদের সমুদয় তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার মীমাংসা। যাঁহা হইতে এ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, তাঁহাতে যাহা নাই, বিশ্বে কুত্রাপি তাহা সম্ভব হয় না। সৌন্দর্য্য—পদার্থের গুণই হোক্, আর উপভোক্তার মানস ভাবই হৌক, অবশ্যই তাহা সেই আদি ও মূল পদার্থে বিরাজমান।

"সচ্চিদানন্দমদ্বৈতম্"

সেই অদ্বৈত পদার্থ সচ্চিদানন্দময়। সৎ ও চিতের আলোচনা আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয় নহে; তথাপি পরোক্ষভাবে তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সেই ব্রহ্ম পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ আছেন; তাঁহা হইতেই এ অখিল জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। 'অহং'জ্ঞান যেমন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, তাহার এই সৎস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থও তেমনি আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। এ সম্পর্কে,

যুক্তি ও তর্কের অবতারণা অনাবশ্যক। তাহা আবার "চিৎ" চিন্ময় বা চৈতন্যময়। এই স্বরূপটিও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ; কারণ অচেতনের পক্ষে ঈদৃশী আলোচনা আদৌ সম্ভবপর নহে।

তৎপরে সেই অদ্বৈত ব্রহ্মপদার্থই "আনন্দম্," তিনিই আনন্দময়। এই আনন্দ-স্বরূপটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সৌন্দর্য্য-প্রহেলিকার সমাধান হয়, এবং এ তত্ত্বটি সুমীমাংসিত হইয়া যায়। কিন্তু আনন্দ-স্বরূপটিকে উপলব্ধি করা তত সহজ নহে; আর, সেই আনন্দ যে কি, তাহাও বুঝিয়া উঠা নিতান্তই কঠিন। অনেক সময়ে আমরা এই আনন্দকে দৈহিক ও মানসিক সুখানুভূতির সহিত মিশাইয়া ফেলি, এবং তাহাকে দেহজ বা মানস সুখানুভূতি বলিয়াই মনে করি। কিন্তু আমার বোধ হয়, আনন্দ কেবল তাহাই নয়,—উহার অনেক ঊর্দ্ধে। আনন্দ উপভোগেরই সামগ্রী বটে।—তবে কি, ব্রহ্ম-পদার্থে আমরা এই স্বরূপটির আরোপ করিয়া তাঁহার 'ভোক্তৃত্ব' পরিকল্পনা করিতেছি? এবং তাহাতে কি, নির্গুণকে সগুণ করিতেছি না? নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ, অসম্পৃক্ত, স্বাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যকে এভাবে কি ভোগায়তন—দেহীর গুণবিশিষ্ট করিয়া তোলা হয় না? আমার মতে, তাহা নহে। ব্রহ্ম-পদার্থ যদি শুধু সচ্চিদাত্মক হইতেন এবং আনন্দ-ঘন বা আনন্দময় না হইতেন—তবে "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এই সূত্রের কোন অর্থই থাকিত না, জন্ম, জীবন ও মৃত্যু একেবারেই প্রহেলিকা থাকিয়া যাইত; সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কোন বিশদ ব্যাখ্যাই সম্ভবপর হইত না। এই আনন্দ

স্বরূপ হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তিনি আনন্দঘন বা আনন্দময় বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস; বিবর্ত্তন আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন; প্রকাশ, বিকাশ ও বিনাশ।

"আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজানাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

বাস্তবিক এই দার্শনিক আলোচনা দ্বারা আমরা আমাদের প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয় হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি; এবং অনেকে ইহাও মনে করিবেন যে, যে জটিল ও গূঢ় তত্ত্বের সমাধান কোন দর্শনেই করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার অবতারণা দ্বারা বক্ষ্যমান বিষয়ের জটিলতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

কিন্তু যখন আমি বিবেচনা করি যে, প্রাচ্য দর্শনের মতে 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে'র মূল এই স্থানে, তখন এই আংশিক আলোচনা অনিবার্য্য এবং আমার ধৃষ্টতাও মার্জ্জনীয়। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"তাঁহার আনন্দ-ধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে
এস সব নর-নারী আপন হৃদয় ল'য়ে!

* * *

সে পুণ্য নির্ঝর-স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত-ধারা পূরিয়া হৃদয়-প্রাণ!"

আমরা বাস্তবিকই সেই আনন্দ-ঘনের আনন্দ ধারায় অভিষিক্ত বলিয়া, তাঁহার আনন্দ-ধারার কণামাত্র পান করিতে সমর্থ বলিয়াই, নিত্য সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্য-উপভোগক্ষম এবং সুন্দরকে কেবলই সন্ধান করিয়া ফিরি। সেই আনন্দের অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্যে,—অথবা আনন্দই সৌন্দর্য্যোপভোগ। এই তত্ত্বটি যে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহা নহে। তাঁহারাও "The true, The good, The beautiful"—সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অনেক মনস্বী ব্যক্তি—যাহা সত্য তাহাই শিব, এবং যাহা শিব, তাহাই সুন্দর বলিয়া, সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যাহা অসত্য—যাহা অশিব বা অমঙ্গল-প্রসূ, তাহা কখনও সুন্দর হইতে পারে না।

ব্রহ্মের সৎস্বরূপ জগতে অভিব্যক্ত, এবং তাহাই জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য ও উদ্দিষ্ট; চিৎস্বরূপ জীবগণের মনে প্রতিবিম্বিত, সুতরাং সেটি মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত; আর, তাহার আনন্দস্বরূপ তদূর্দ্ধ—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিবেচ্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

শ্রুতিঃ।

যাঁহারা অধ্যাত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন নহেন তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বোধ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইতে পারে না।

"সেষাভার্গবী বারুণী বিদ্যা
পরমে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতা।"

বাস্তবিকই ললিতকলা ও সুকুমার শিল্পসমূহের উৎপত্তির আলোচনা করিতে গেলেও দেখিতে পাই যে, দেবোদ্দেশ্যেই তাহাদের জন্ম; মন্দির-নির্ম্মাণে স্থাপত্য, দেব-প্রতিমা-গঠনে ভাস্কর্য্য, দেব-মন্দির ও দেব-সান্নিধ্যে আরতি-উপলক্ষে নৃত্য-কলা, দেব-লীলা স্ফুটীকরণে নাট্যকলা, দেব-চিত্র চিত্রণে চিত্র-শিল্প, দেব মহিমা কীর্ত্তনে সঙ্গীত, এবং দেব-মহিমা ছন্দে গ্রন্থনে কাব্য জন্ম লাভ করিয়াছে। এ কথাটি আমার মনঃকল্পিত নহে,—বোধ হয় ইতিহাসও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে। প্রাচীন ঋক্‌মন্ত্রসমূহের গ্রন্থন, সাম-গান, ভারতীয়, মিশর-দেশীয়, ব্যাবিলোনিয়া ও গ্রীকদেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এবং সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন চিত্রাদি উল্লিখিত বাক্যের সমর্থন করে।

যাঁহারা বিশেষজ্ঞ ও সুকুমার শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই ধারণারই সমর্থক অভিমত দিয়াছেন। গ্রীক ও হিন্দুদিগের সকল সুকুমার শিল্পেরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। হিন্দুদিগের বিশ্বকর্ম্মা হইতে বীণারঞ্জিতপুস্তক-হস্তা ভারতী, এবং গ্রীকদিগের মিনার্ভা হইতে অরফিয়স্ পর্য্যন্ত সকল দেবতাই জগতে ললিতকলার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

মানব-মনে সৌন্দর্য্যের যতটুকু ধারণা এবং মানবের হৃদয়ে আনন্দ-ঘনের যতটুকু আনন্দ বিরাজমান তাহাই নানাপ্রকারে,

নানা আকারে, ললিতকলা-মুখে সুকুমার শিল্পে বিকশিত হয়,—অন্তঃসৌন্দর্য্য বাহিরে প্রকট হয়।

অনাবিল সৌন্দর্য্যই ললিতকলার বিষয়। যাহা মলিন, যাহা পঙ্কিল, যাহা কুৎসিত, যাহা জঘন্য, যাহা সর্ব্বতোভাবে জড় ও পশুভাবাপন্ন, তাহা সুকুমার শিল্পে প্রতিভাত হয় না। যাহা উজ্জ্বল, যাহা মধুর, যাহা শান্ত, যাহা পবিত্র, যাহা আধ্যাত্মিক ও যাহা দিব্য তাহাই মুখ্যতঃ ললিতকলার অন্তর্নিবিষ্ট।

আনন্দময়ের আনন্দ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে বিকশিত। আর, মানব-হৃদয়ের আনন্দের বহির্ব্বিকাশই সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যে। রস-বোধে ও ভোগেই আনন্দ; তাই তাঁহাকে রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের এই অন্তরঙ্গের বিষয় আলোচনা না করিয়া, অনেক পণ্ডিত নানাপ্রকারের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিবিধমতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহ বা উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিতাকেই সৌন্দর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—"Beauty is utility." কেহ বহুত্বে একত্বের—"Unity in variety"—বিশৃঙ্খলে শৃঙ্খলার সমাবেশকে—সৌন্দর্য্য বলিয়াছেন। কোন কোন মনস্বী, রমণীদেহের লাবণ্যকেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই! বাগ্মিপ্রবর এড্‌মণ্ড বার্ক ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে—যে যে পদার্থ পূর্ব্বানুভূত আনন্দ ও সুখপ্রদ ভাবকে উদ্রিক্ত করিতে পারে.

তাহাই সুন্দর। লিও টলষ্টয়ের মতেও—ললিতকলাসমূহের উদ্দেশ্য শিল্পীর অনুভূত ভাব সমূহ নানা উপায়ে অপরে সংক্রামিত করা।—'To transmit the feeling, one has experienced, to others by means of movements, lines, colours, sounds or forms expressed in words, is the activity of Art." সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এবংবিধ বহুমতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, সৌন্দর্য্য বস্তু বা পদার্থের কোন বিশেষ একটি গুণ নহে। বহুগুণের সমবায়ে মানব-মনে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই আমাদের রসবোধ বা সৌন্দর্য্যানুভূতি, এবং সেই গুণসমষ্টিই বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য।

এইরূপ মিশ্র পদার্থের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের প্রয়াস ব্যর্থ। তবে, সংক্ষেপতঃ সৌন্দর্য্যের কতকগুলি লক্ষণের আলোচনা করা যাইতে পারে।

আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে নয় কি দশ প্রকার রসের উল্লেখ দেখিতে পাই ;

"শৃঙ্গারবীরবীভৎসরৌদ্রহাস্যভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুতশান্তাশ্চ নবনাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ" ॥

—ইতি রত্নকোষঃ।

আবার অন্যমতে—

"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ।
বীভৎসরৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসা দশ" ॥

—ইতি নামনিধানম্।

ইহার মধ্যে সকল রসের উদ্রেকই যে ললিতকলার উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে বা ইন্দ্রিয়পথে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জন্মিলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সৌন্দর্য্যানুভূতির সহায়ক নহে। নিম্ন শ্রেণীর ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রসানুভূতি হয়, তাহাকে সৌন্দর্য্যানুভূতি বলা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ যেমন জ্ঞানলাভের দ্বারস্বরূপ তেমনই আবার বিশেষভাবে সৌন্দর্য্যবোধেরও সহায়ক। দর্শনীয় বস্তু কখনও একজনের দৃষ্টিদ্বারা নিঃশেষ হয় না, শ্রবণীয় শব্দও কোন এক প্রাণীর শ্রবণ মাত্রেই বিলুপ্ত হইয়া যায় না। কিন্তু একটি স্বাদু ফল সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য নহে, একটি সুখ-স্পর্শ সামগ্রীও সকলের স্পর্শনীয় নহে। সুতরাং একটি সুমিষ্ট ফল, বা একটি কোমল পদার্থকে কেহ সুন্দর বলিবেন না।

সুকুমার শিল্পের সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে, মুখ্যতঃ এই কয়েকটি লক্ষণ দেখিতে পাই।—

(১) আনন্দোৎপাদনই ললিতকলার প্রধান ফল ও উদ্দেশ্য; কিন্তু পানাহারের উদ্দেশ্য—বেদনা, পীড়া ও মৃত্যুকে দূরীকরণ,—আনন্দোৎপাদন নয়।

(২) যাহা কিছু অপ্রীতিকর তাহা একেবারেই সুকুমার শিল্প হইতে বর্জ্জিত হইবে।

(৩) ললিতকলা-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য সকলেরই উপভোগ্য। ব্যক্তিবিশেষের সম্ভোগের জন্য নহে। এই লক্ষণটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ললিতকলানুশীলনই যে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য,

সহানুভূতি ও সামাজিকতা উদ্রেকের প্রধান উপায় তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অনেক লোভনীয় সামগ্রী উপভোগের জন্য পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও কলহের উদ্ভব হয়; কিন্তু তাজমহলের শোভা, অজন্তার চিত্রাবলী দেখিয়া লক্ষ লক্ষ মানব মুগ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে;—কালিদাসের 'শকুন্তলা' বিশ্বমানবের সমক্ষে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে। এখানে হিংসা, দ্বেষ ও কলহ নাই। তজ্জন্যই ইহাকে সামাজিক ভাবোদ্দীপনের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় মনে করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও মনস্বিগণ সুকুমার শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বহু মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণতঃ সেই মতগুলিকে, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) বাস্তবের বা বস্তুতন্ত্রতার অনুসরণই এক শ্রেণীর লক্ষ্য;—ইঁহারা বাস্তবাদর্শাবলম্বী (Realistic). অপর শ্রেণীর উদ্দেশ্য—(২) ভাব-তন্ময়তা বা কল্পনা-তন্ত্রতা, সামান্য উপায়ে সুমহান্ ভাবের উদ্দীপনা। ইঁহারা কল্পনাদর্শাবলম্বী—(Idealistic)। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়পথে বহির্জ্জগতের রসটুকু মানবাত্মায় প্রসৃত বা আকৃষ্ট হইয়া আনন্দোৎপাদন করিলে তাহাতেই আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি হয়; এবং সেই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ বা মানবাত্মার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই ললিতকলায় পরিস্ফুট। নিসর্গ-নিষ্ঠা থাকিলেও কিংবা বাস্তবের অনুসরণ করিতে গেলেও ললিতকলা-মুখে 'বাস্তব' যাহা তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে না;—কলাবিদের বা শিল্পীর আভ্যন্তরীণ

আনন্দের 'ছাপ' তাহাতে রহিয়া যাইবেই, এবং তাহা না হইলে উহা শিল্প-পদবাচ্যই নহে। যাহা কুৎসিত, কদাকার বা ঘৃণ্য, তাহাও শিল্পীর আত্মায় প্রতিভাত হইলে, তাহার কথঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটিয়াই থাকে,—জড়ত্ব বহু পরিমাণে বিদূরিত হইয়া আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয়।

কথাটা এই—প্রকৃতির যে দ্রব্য বা বস্তু যে প্রকারের, তাহার মানস-প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব সেই দ্রব্য বা বস্তু হইতে অনেক বিভিন্ন। সেই মানসী প্রতিকৃতি যখন শিল্পী, স্বীয় শিল্পচাতুর্য্যে বাহিরে ফুটাইয়া তোলেন, তখন সেই শিল্প-সৃষ্ট পদার্থে আর বাস্তব পদার্থে অনেক পার্থক্য জন্মিয়া যায়। মানবাত্মার কটাহে, আনন্দের উত্তাপে, বস্তু বা পদার্থের যে পচন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, তাহাতে তাহার অনেক স্থূলাংশ পরিত্যক্ত ও রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব ও সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তথা-কথিত এই বস্তুতন্ত্রতাও মুখ্যতঃ ভাব-তন্ত্রতা বা কল্পনা-তন্ত্রতা।

অপরদিকে যাহাকে আমরা ভাব-তন্ত্রতা বলিতেছি তাহাও সর্ব্বতোভাবে 'বস্তু'-নিরপেক্ষ নহে। যতই উদ্দাম, যতই নিরঙ্কুশ হউক না কেন, কল্পনা কখনই 'বস্তুকে' সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন, বা অতিক্রম করিতে পারে না। বিশেষতঃ শিল্পী-সৃষ্ট পদার্থের যখন জনগণের আনন্দোদ্রেকই একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন যে সৃষ্টি, জনগণের বস্তুজ্ঞানকে একেবারেই অতিক্রম করে তাহাতে আনন্দের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব?

দেশ, কাল ও পাত্র—শিক্ষা, দীক্ষা ও অবস্থাভেদে যে শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রভেদ ও তারতম্য হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? শিল্প-কলার নিয়ম ও প্রণালী (Technique) বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাতে শিল্পীর স্বাধীনতা কিছুতেই খর্ব্ব হইতে পারে না। "প্রবাসী" পত্রে আমাদের শিল্পাচার্য্য, জগদ্বিখ্যাত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমার সহযাত্রী বন্ধু ও শিষ্যবর্গকে এই অনুরোধ যে, শিল্প-শাস্ত্রের বচন ও শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তি—লক্ষণ ও তাহার মান ও প্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহারা যেন গ্রহণ না করেন অথবা নিজের শিল্পকর্ম্মকে শাস্ত্র-প্রমাণের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া স্বাধীনতার অমৃতস্পর্শ হইতে বঞ্চিত না হইয়া পড়েন।

"উড়িতে শক্তি যতদিন না পাইয়াছি, ততদিনই নীড় ও তাহার গণ্ডি। গণ্ডির ভিতরে বসিয়াই গণ্ডি পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়। তার পর একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এটা মনে রাখা চাই যে, আগে শিল্পী ও তাহার সৃষ্টি, পরে শিল্প-শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার। শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র।"

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িলেই বঙ্গদেশের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রসমূহে উদীয়মান শিল্পী ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের শিল্প-চাতুর্য্যের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে ও হইতেছে তাহার একটু আলোচনা স্বতঃই করিতে ইচ্ছা হয়।

ভারতীয় শিল্প-কলার যে নবযুগ-প্রবর্ত্তককে পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক হাভেল্, চেটার্টন্, ব্রাউন্, মিস্ নোবেল্-প্রমুখ মনস্বিগণ ভক্তিভরে আবাহন করিয়াছেন, অস্মদ্দেশীয় অনেক সমালোচকের মতে সেই শিল্প-যুগই ভারতীয় শিল্প-কলার অধঃপতনের সূচনা করিতেছে! আমরা মুখে যতই স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার ভান করি না কেন, ইহা অবিসংবাদী যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ আমরা কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছি না। সেই মোহের আবরণ আমাদের গৃহ-সজ্জায়, বসনে ও ভূষণে, শিল্পে ও সাহিত্যে—সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান হইবে। আমাদের রুচিই সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তবে কি পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ নাই বা থাকিলেও নিম্ন স্তরের?—আমি তাহা বলিতেছি না। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে আদর্শের যে বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে তাহারই ভিতরে জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতা। উচ্চ-শ্রেণীর শিল্প চিরকালই জাতীয়তার গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া সার্ব্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে; আর, ইহাও সত্য যে, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া শিল্প ও সাহিত্য যখন বিশ্বজনীন ও বিশ্বতোমুখী হইয়া উঠে তখনই তাহার চরম সার্থকতা। কিন্তু মানবাত্মা কখনও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই উধাও হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হয়ত গীতার

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ"

এই শ্লোকাংশেরও ইহাই মর্ম্ম। সে যাহাই হউক, ভারতের

জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য যে সনাতন জাতীয় বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কখনও আর চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। সেই বিশেষত্বটুকু কি? ইহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, আধ্যাত্মিকতা, আন্তরিকতা বা অন্তর্মুখীনতাই সেই বিশেষত্ব। ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য বিশেষভাবে কল্পনাদর্শাবলম্বী ও ভাব-তন্ত্র (Idealistic).

কবিবর রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট হওয়াতেই, পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার শিরে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের বিরাট্ রাজ-সভায় বরণ করিয়া লইয়াছে। তাঁহার 'গীতাঞ্জলির' ভাব ও ভাষাকে কেহ কেহ বাইবেলের, কেহ বা টমাস্ এ কেম্পিসের আধ্যাত্মিক ভাব ও ভাষার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু, বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে, পাশ্চাত্য ভাব গ্রহনে, কি কবিতার ঝঙ্কারোৎপাদনে, রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হয় নাই,—তাঁহার আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি সেই সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায়, সেই উপনিষৎ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাবপ্রকাশে। পাশ্চাত্য জগৎ তাহাতেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া, কবিত্বের "নন্দনকানন মাঝে, সুরগণ সদনে" তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলির "লম্বা লম্বা, লতানে" আঙ্গুল, শীর্ণ-দেহ-যষ্টি প্রভৃতির প্রতি কতই ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছে; কিন্তু, তাঁহার চিত্রিত 'অস্বাভাবিক' বা অবাস্তব চিত্রগুলির মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল যে অপার্থিব সুষমা ও

আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত, তাহাই শিল্পির বিশেষত্ব এবং তাহাই এই সকল অস্বাভাবিক ও অবাস্তব পত্তন ভূমিতে ('Backgrouud'এ) ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্বটুকুই হ্যাভেল্ ও চেটার্ট্নের ন্যায় বিশেষজ্ঞগণের নিকটে আদরণীয়রূপে গণ্য হইয়াছে। সে দিন বহুদূরে নয়,--যে দিন, আবার পাশ্চাত্য শিল্প-কলা-বিদ্গণও এই ভারত-শিল্পীর কণ্ঠে সাগ্রহে জগৎ-শিল্প-সভার বরমাল্য প্রদান করিবেন।

দেখা যাইতেছে যে, আমাদের ধারণা ও স্মৃতির সুবিধার জন্য আমরা যত প্রকার শ্রেণীবিভাগই করি না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন একটি বিভাগ বা শ্রেণী অপর শ্রেণী ও বিভাগ-নিরপেক্ষ নহে। বিশ্বের সমস্তই এক সূত্রে গ্রথিত এবং বিশ্ব-যন্ত্র সমগ্রই একই সময়ে স্পন্দিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। শিল্পে বাস্তবাদর্শানুগামী ও কল্পনা-দর্শানুসারীর মধ্যে বিভেদ অতি সামান্যই।

শিব-তন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার কথা ছাড়িয়া দিয়া, (বলা বাহুল্য যে শয্যারচনা হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল কর্ম্মই এই চৌষট্টি কলার অন্তর্ভূত), আমরা যদি প্রধান প্রধান ললিতকলাসমূহের আলোচনা করি, তাহাতেও মানব-মনের মুক্তিমার্গে উড্ডয়নের ইতিহাসই দেখিতে পাইব। অচৈতন্য, জড়ভাব হইতে ক্রমশঃ চৈতন্যে উপনীত হইলেই আত্মোপলব্ধি বা মুক্তি। শিল্প-কলাসমূহেই, জড়ের উপর চৈতন্যের, দেহের উপর দেহীর প্রভাব ও বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করে। এইখানেই জড় পদার্থকে মানব আত্মা আত্মানুরূপ করিয়া তোলে। কথাটা আর

একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, জড়-পদার্থনিচয়কে মানবাত্মার ব্যবহার ও উপভোগের উপযোগী করিয়া তোলাই শিল্পীর কার্য্য। শিল্পেই, জড় চৈতন্যের ভৃত্য, ও চৈতন্য জড়ের প্রভু।

ললিতকলার মধ্যে স্থাপত্যের স্থান সর্ব্বনিম্নে। ইহাতে জড়-পদার্থেরই আবশ্যকতা অধিক। আর, স্থপতির যে ভাব স্থাপত্য প্রকাশ করিতে চাহে তাহা অতি অসম্পূর্ণ রূপেই পরিস্ফুট হয়।

ভাস্কর্য্যের স্থান তদূর্দ্ধে। মর্ম্মর ও ধাতুর সাহায্যে আধ্যাত্মিক ভাব তত সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত করা যায় না।

চিত্র-কলা আধ্যাত্মিকতায় স্থাপত্যও ভাস্কর্য্যের অনেক উর্দ্ধে। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য সর্ব্বথা জড়-পদার্থের সাহায্যেই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে; কিন্তু চিত্র-শিল্পে জড়পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—এই তিনের একটি গুণকে পরিহার করিয়া,—অর্থাৎ কেবল সমতল ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে।

তথাপি চিত্র-শিল্প, সঙ্গীতের ন্যায় আধ্যাত্মিক নহে। তাল, মান, লয় ও স্বর সহযোগে আত্মার বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করাই সঙ্গীতের কার্য্য। ইহাতে জড়ের সাহায্য অতি সামান্য।

তদূর্দ্ধে কবিত্ব—ললিতকলানিচয়ের শিরোভূষণ। ভাষার সাহায্যে অধ্যাত্মজগতের সকল রস-সম্পৎ বিশ্ব-সমক্ষে উপস্থিত করাই কবিত্বের লক্ষ্য ও কার্য্য। আমি এস্থলে কবিত্বের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করার বৃথা প্রয়াসে সাহসী নই। আনন্দোৎপাদনই কবিতার লক্ষ্য। ভাষা, বাক্য, ছন্দ ইত্যাদি সেই লক্ষ্য সাধনের

উপায় মাত্র, এবং ছন্দ ব্যতিরেকেও যে কবিতা হইতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ, আনন্দোদ্রেকেই—কাব্যকলার চরিতার্থতা। জর্ম্মান্ দার্শনিক হেগেলের মতে কাব্য-কলার চরমোৎকর্ষ নাট্যকলায় (Dramatic Poetryতে)। এই মত কতদূর সমীচীন তাহা কবি ও কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন। তাঁহার মতে কাব্য-কলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রের যুগ মহাকাব্যে (Epicএ)। ইহাই কবিত্বের শৈশব। ইহাতে শাব্দিকতা, অলঙ্কার, বিস্ময়সূচক চিত্রের সমাবেশ বেশী,—শিশুর কল্পনার ন্যায়। আর সঙ্গীত-কলার যুগ—গীতিকাব্যে। নাট্য-কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হউক বা না-ই হউক্, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের তিরোধান ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আজকাল আর কেহ 'Grand Epics'এর—মহাকাব্যের—উৎপত্তির আশা করিতে পারেন না। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের কাব্যকলার বিষয় আলোচনা করিলেও যেন হেগেলের মতই সমর্থিত হয়। 'রঘুবংশ' ও 'কুমার সম্ভব', 'মেঘদূত' ও 'ঋতু-সংহার', 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'শকুন্তলা'র বিষয় চিন্তা করিলে—সকলে দার্শনিকপ্রবরের মতই সমর্থন করিবেন। 'শকুন্তলা' যে কাব্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও কবিগণও সমর্থন করিয়াছেন। কালিদাস মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। কবিত্বের ইতিহাসের সর্ব্বযুগই তাঁহার কাব্যে স্ফুটীকৃত। তাঁহার কাব্যাবলীর মধ্যে "শকুন্তলা"র

শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী, এবং তাঁহার রচনাসমূহ আলোচনা করিলে হেগেলের মতই সমর্থিত হয়।

মানবজীবনেও সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, যেমন সমাজ ও জাতির ইতিহাস পরিব্যক্ত হয়,—অর্থাৎ জীব-জগতের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে—একজন কবির কাব্য-জীবনেও সেই প্রকার কাব্য-কলার বিবর্ত্তনের সোপানশ্রেণী দেখিতে পাই।

প্রকৃতির অনুসরণ বা অনুকরণই ললিতকলার কার্য্য নহে। অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই তাহার লক্ষ্য। অনুকরণ বা অনুচিকীর্ষা উপায় হইতে পারে; কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্য নহে। নিসর্গ-নিষ্ঠা একেবারে অনুকরণ নহে। এস্থলে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মত আপনাদিগকে উপহার দিতেছি;—"The ideal without the real lacks life; but the real without the ideal lacks pure beauty. Both need to unite; to join hands and to enter into alliance. In this way the best work may by achieved. Thus beauty is an absolute idea and not a mere copy of imperfect nature." বাস্তব ছাড়িয়া কেবল কল্পনার আশ্রয় লইলে, ঠিক জীবনটি পাওয়া যাইবে না। উভয়ের সম্মিলন আবশ্যক, এতদুভয় একত্র হইলেই যথার্থ বিশ্বসৌন্দর্য্য সৃষ্ট হয়। অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ প্রকৃতিচিত্রই সৌন্দর্য্য নহে; সৌন্দর্য্য সেই অসম্পৃক্ত ও নির্ব্বিকল্প ভাব।

প্রকৃতিতে যাহা সুন্দর বলিয়া গণ্য হয় না, শিল্পকলার সাহায্যে তাহাও সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের সানুদেশস্থ বন্ধুর উপলখণ্ড পর্ব্বতারোহীর পক্ষে পীড়াদায়ক; লতাগুল্ম-পাদপাদি বিরহিত প্রান্তর-দৃশ্য কখনও দর্শকের প্রীতিকর নহে; কিন্তু চিত্রে পার্ব্বতীয় দৃশ্য ও প্রান্তরের ছবি কতই মনোমদ! ইহার কারণ—শিল্প-কলা হইতে সমস্ত পীড়া, বেদনা ও ক্লেশের স্মৃতি বিলুপ্ত ও তিরোহিত হইয়া যায়। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিল্প-সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সর্ব্বপ্রধান উপাদান—শিল্পীর আত্মার আনন্দ ও মহাভাব।

এতদুপলক্ষে একটি গল্প মনে পড়িতেছে।—বিশ্রুতকীর্ত্তি চিত্র-শিল্পী 'গুইদো'কে কোন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি যে আদর্শে তাঁহার অশেষ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি সেই আদর্শ দেখাইতে পারেন কি না। গুইদো তৎক্ষণাৎ তাঁহার এক দীর্ঘবপু কদাকার ভৃত্যকে ডাকিলেন এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—'এই আমার আদর্শ!' ভদ্রলোক ত একেবারেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত! গুইদো তখন বলিলেন, 'মহাশয়, সৌন্দর্য্য মানবাত্মা-সম্ভূত; সুতরাং বাহ্যাদর্শ যাহাই হউক, তাহা অবলম্বন করিয়াই সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইতে পারে। যে ছবিগুলি আঁকি, সেগুলি আমার মানসী-প্রতিমা মাত্র।'

যাহার হৃদয়ে সেই ভূমানন্দের কিয়দংশও অবভাসিত হইয়াছে, তিনিই এই জড়-প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে সৌন্দর্য্য ও শোভা দেখিতে পাইবেন; আর যে স্থলে সে আনন্দের কণামাত্রও উপচিত

হয় নাই, সে স্থলে সৌন্দর্য্যানুভূতিও নাই। অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে শোভানুভাবকতা ও শিল্পকলানুশীলনের বড় একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদ্বারা সৌন্দর্য্যের "আধ্যাত্মিক স্বরূপ"ই প্রকাশিত হইতেছে। শিল্পকলানুশীলন সুসভ্য জাতির পক্ষেই সম্ভব।

আমি যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বাক্যদ্বারা প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, মনীষী কুজে'র গ্রন্থেও সেই ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছে ;— 'The true, the good and the beautiful are but forms of the Infinite. What then do we really love in truth, beauty and virtue? We love the Infinite Himself. The love of the Infinite substance is hidden under the love of its forms". সত্য, শিব ও সুন্দর এই অনন্তেরই বিভিন্ন প্রকৃতি মাত্র; সত্য শিব ও সুন্দরকে ভাল বাসিয়া, আমরা এই অনন্তকেই ভালবাসিয়া থাকি। বিভিন্ন ভাবের ভালবাসার অভ্যন্তরে সেই অসীমের প্রতি প্রেমই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্য ও তাহার প্রকৃতি

এই শোকতাপময়, দুঃখবহুল মানব-প্রাণে সৌন্দর্য্য-পিপাসা কেন সমুদ্ভূত হইল, কেন জীবনের এই ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে সংগ্রামোপযোগী নানাবিধ উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া, মানবাত্মা সৌন্দর্য্য ও শোভার উপাসনায় নিরত রহিয়াছে, কেনই বা মানব-হৃদয়ে ললিতকলানুরক্তি উদ্বোধিতা হইল? এই সমস্ত অত্যন্ত জটিল দার্শনিক প্রশ্ন হইলেও সকলেই ইহার সমাধানে সমুৎসুক। আমরা পদার্থ, কার্য্য ও ভাব বিশেষকে 'সুন্দর' এই বিশেষণে বিশেষিত করি; কিন্তু সৌন্দর্য্য কি পদার্থের গুণ? দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, শৈত্য, উষ্ণতা, গুরুত্ব লঘুতা প্রভৃতি যেমন পদার্থের গুণ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়, সৌন্দর্য্যও কি তদ্রূপ একটি গুণ? যদি তাহাই হইবে, তবে সুন্দরে ও কুৎসিতে পার্থক্য কোথায়? অথবা কোন গুণের আধিক্য, কি অল্পতা, সাম্য ও বৈষম্যই কি সৌন্দর্য্য? তাহা নয়। কখনও অতি দীর্ঘ পদার্থও সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। কখনও নাতিদীর্ঘ পদার্থও সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যাহাকে সৌন্দর্য্য কি শোভা বলি, তাহা পদার্থের কোন একটি গুণ নহে, অবস্থা বিশেষে কোন কোন গুণের সমবায়ে, মানব হৃদয়ে, যে পদার্থ চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করিতে পারে, তাহাকেই

'সুন্দর' বলি। শোভন সামগ্রী সমূহের মধ্যে কোনো সাধারণ চিহ্ন কি বিশেষত্ব অন্বেষণ করিলে, আমরা কিছুই পাই না। সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্যের সাধারণ সম্মিলন ক্ষেত্র মানব-হৃদয়। অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ একই প্রকারে মানবের চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি সমূহের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে, তাহাই সুন্দর।

ললিতকলার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। একটি এই যে, ইহা কেবল চিত্ত রঞ্জিনী বা হ্লাদিনী-বৃত্তি নিচয়কেই সম্বোধিতা করে, আনন্দোৎপাদনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে ভূমানন্দ লাভ করা যায়, তাহাকেই ললিতকলার চরমোদ্দেশ্য বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়—ইহাতে নিরানন্দ, অশান্তি ও উপদ্রবের নাম গন্ধ থাকিবে না। তৃতীয়—ইহার উপভোগ ব্যক্তি-বিশেষ কি শ্রেণীবিশেষে নিবদ্ধ নহে, অর্থাৎ ইহা মানব-সাধারণের উপভোগ্য। বালারুণের বিশ্ব-বিমোহন রূপ, অস্তাচলগামী সূর্য্যের মাধুর্য্য, চন্দ্রমার অমল ধবল জ্যোৎস্নারাশি, নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশের মোহন ছবি, উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল সাগরের বিশালতা প্রভৃতি প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরই উপভোগ্য। উহা প্রত্যেক নরনারীরই জাতি, ধর্ম্ম, অবস্থা নির্ব্বিশেষে উপভোগের সামগ্রী।

বিহগের কাকলি, কিন্নর-কণ্ঠ গায়ক গায়িকার সংগীত লহরী, যন্ত্রাদি নিঃসৃত মধুর ধ্বনি, জগৎবাসী প্রত্যেকেরই আনন্দোৎপাদন করে। বীণাপাণির বর-পুত্র কালীদাসের অমর লেখনী বিনিঃসৃত কবিতা-লহরী, সেক্ষপীয়রের কবিতা মাধুর্য্য, ও অন্যান্য কবিকুলের

বীণার ঝঙ্কার, সকল সময়ে সর্ব্বদেশে সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। রেফেল্, মাইকেল্ এঞ্জেলো, টিসিয়ান্, রবিবর্ম্মার চিত্র সকলেরই নয়নাভিরাম। সৌন্দর্য্যের ও ললিতকলার এই সার্ব্বজনীনতা ও বিশ্বব্যাপিতা হইতেই, অনেকে ধর্ম্মানুশীলন ও ললিতকলার অনুশীলন একই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মহাত্মা রস্কিন্ ললিতকলাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সেই রাজার রাজা, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর অনন্ত শোভা ও ঐশ্বর্য্যশালী, অমিত প্রতাপশালী বিশ্বেশ্বর। অর্থাৎ তাঁহার বহুত্বে একত্ব, অনাদ্যনন্ত ও প্রশান্ত ভাব, পবিত্রতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতিই সৌন্দর্য্যের নিদান। সুতরাং যাহাতে স্বার্থ-পরতা, নীচতা, হিংসা, দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধির গন্ধ থাকিবে, তাহা ললিত-কলার অন্তর্নিবিষ্ট নহে। সুখাদ্য আহার করিলে, সুপেয় পান করিলে, সৌরভ ঘ্রাত হইলে যে প্রকারের আনন্দ হয়, এ আনন্দ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুখাদ্য একজনে আহার করিলে, সুপেয় একজনে পান করিলে এবং সৌরভ কয়েক জনে গ্রহণ করিলেই তাহা নিঃশেষ হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা অবধি, আগ্রার সুরম্য তাজমহলের শোভা কত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ও মনকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়াছে! যাহা উপভোগেই নিঃশেষিত হয়, তাহা সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তাহাতে যে সুখোৎপাদন করে তাহা নীচ ইন্দ্রিয়-সুখ। ইন্দ্রিয়-গ্রাম কিয়ৎ পরিমাণে অতিক্রম করিয়া, আধ্যাত্মিক রাজ্যে গমন না করিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপভোগ হয় না।

কবিতা, চিত্র, সঙ্গীত ও স্থাপত্য প্রভৃতি চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তি সাধন করে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ভাবযোগে, চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তিকে জাগাইয়া আনন্দোৎপাদনই ইহার কার্য্য ; একটি তারে সংঘাত করিলে যদি সহস্র সহস্র তার বাজিয়া উঠে, একটি সামান্য চিহ্ন দ্বারা যদি অযুত ভাবে হৃদ্‌ক্ষেত্র আন্দোলিত হয়, তবেই বুঝিব যে, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছি। অনেকে যাহা প্রয়োজনীয়,—যাহা ব্যবহার্য্য, যাহা উপযুক্ত, তাহাকেই সুন্দর বলিয়া থাকেন, কিন্তু সৌন্দর্য্য কেবল ব্যবহারোপযোগিতায় নিবদ্ধ নহে। যাহাতে নির্ম্মল আনন্দ, অশেষ বিস্ময় ও সময়ে সময়ে হাস্যের উদ্রেক করে, তাহাই ললিতকলার বিষয়ীভূত। যাহা নীচ, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা অপবিত্র ও যাহা ঘৃণ্য, তাহা সমস্তই সৌন্দর্য্যের প্রতিষেধক। একটি সামান্য অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অনেক সুললিত কাব্যের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। সামান্য একটি অশান্তিকর ও বিরক্তিজনক রেখা দ্বারা অনেক সুযত্ন-চিত্রিত চিত্রের শোভা নষ্ট হইয়াছে। যাহা নীচ, যাহা মলিন, যাহা অপবিত্র, যাহা কলুষিত ও যাহা ক্ষুদ্র, তাহার সংশ্রবে ও সংস্পর্শে ললিত-কলার উদ্দেশ্যীভূত সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। সৌন্দর্য্যের অখণ্ডনীয়তা, বিশ্বজনীনতা ও পবিত্রতাই তাহার বিশেষত্ব। যাহাতে নীচ কামনা, নীচ ভাব ও ইন্দ্রিয়-সুখানুরক্তিকে জাগাইয়া দেয়, তাহা কদাপি সুন্দর নহে। তবে 'সুন্দর' শব্দটি বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সুন্দর অন্ন, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্র প্রভৃতি

বাক্য প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত স্থলে 'সুন্দর' শব্দের অপপ্রয়োগই দেখিতে পাই। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে অনেকে অনেক প্রকারের মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহ কেহ মসৃণতা, কোমলতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণে স্নায়ুসমূহের শৈথিল্য উৎপাদন করে, তাহাকেই সৌন্দর্য্যের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার কেহ মানব-হৃদয়ের দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতিতে উদ্বোধিত করিবার শক্তিকেই সৌন্দর্য্য বলিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সৌন্দর্য্যের আদর্শের বিষয় চিন্তা না করিয়া, সৌন্দর্য্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না।

সৌন্দর্য্য ও শোভার বিষয় চিন্তা করিলেই, যাহাতে বিস্ময় ও হাস্য রসের উদ্রেক করে, তাহা মনে পড়ে। সৌন্দর্য্যের সে সমস্ত লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; বিস্ময় হাস্যোদ্রেককারী পদার্থেও সেই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 'আনন্দরূপং' বলিয়া যাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যের আদর্শ, তাঁহাকে ছাড়া কোন সৌন্দর্য্যই নাই। যাহা কিছু শোভা ও সৌন্দর্য্যশালী, সকলই তাঁহার সেই অনন্ত রূপের সামান্য অভিব্যক্তি। তুঙ্গ-গিরি শৃঙ্গের উচ্চতায়, সরিৎপতির বিশালতায়, মেঘের গর্জ্জনে, বায়ুর নিস্বনে, কোকিলের কূজনে, চপলার চমকে, ফুল্ল কৌমুদীর হাস্যে, কুসুমের সুগন্ধে, কামিনীর কমনীয়তায়, কবির কবিতায়, চিত্রকরের চিত্রে ও গায়কের সুকণ্ঠে, সর্ব্বত্রই সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যের সামান্য প্রকাশ। হে শোভানুরক্ত মানব! একবার সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যের কথা ভাব—বিশ্বময় সৌন্দর্য্য

দেখিতে পাইবে! কবি সৌন্দর্য্যের এই আদর্শ লইয়াই গাহিয়াছেন:—

তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব, উষা নব নব,
প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব।

জলে, স্থলে, গগন তলে,
তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে।

সুখ

প্রথম প্রস্তাব

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে?
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে?
সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অথনির্ব্বাণে
কা'হতে জনমিল জগতের 'যাতনা'?

হেমচন্দ্র।

মানব-প্রতিভার প্রথম বিকাশ হইতেই, মানব-হৃদয়ে প্রজ্ঞার নবোদয় হইতেই, একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে; একটি প্রহেলিকা—সমাধানের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। সে প্রশ্ন ও প্রহেলিকাটি এই:—সুখ কি? জীবন যদি দুঃখময়ই হয় তবে এ অস্বাভাবিক ও নিষ্ঠুর জিজীবিষা কেন? জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে অবিরাম সুখান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু 'সুখের' প্রকৃত সংজ্ঞা অদ্যাপি নির্ণীত হইল না। প্রাণের গভীরতম প্রদেশেও সুখের স্বরূপ অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কদাপি তাহা নির্ণীত হইতেছে না। এই প্রহেলিকার সমাধানকল্পেই দর্শনশাস্ত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; অথবা সুধীবর্গের সুখের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টাই দর্শনশাস্ত্ররূপে জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলিও অনেক পরিমাণে এই প্রশ্ন ও ইহার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে নিয়োজিত। সে প্রশ্নগুলি এই—"শুভ কি? অশুভই বা কি?" এই শুভাশুভের অথবা শুভাশুভবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি কোথায়? আমরা এই সমস্ত গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিব না। সাধারণ ভাবে 'সুখ কি?' এই প্রশ্নের আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, জীবনের প্রারম্ভেই আমরা হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করি, এই হর্ষ ও বিষাদ এত মৌলিক যে, ইহাকে কোন প্রকারে সংজ্ঞিত করা অসম্ভব। শিশুর হর্ষ ও বিষাদ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শিশুর ছোট ও কোমল হাতখানি বিক্ষেপ করিয়া তাহার হর্ষ জন্মিতেছে, সুতরাং ক্রমে সেই হস্তবিক্ষেপ সুখজনক বলিয়া অনুভূত হইয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে। এই মৌলিক হর্ষোৎপাদন ও বিষাদাপনয়ন-আকাঙ্ক্ষাই ক্রমে প্রবলা ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়। আর সুখ কি? যাহাতে হর্ষের উৎপত্তি হয়, তাহাই সুখকর এবং যাহাতে বিষাদ আনয়ন করে তাহাই দুঃখজনক। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, জীবনের মূলে কেবল কতকগুলি বাসনা, তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা। ইহার সমস্তগুলিই অভাব-জন্য। ক্ষুৎপিপাসা শারীরিক অভাব হইতে সমুদ্ভূত, মানসিক বাসনা ও তৃষ্ণার আদিম ইতিহাসও সেই। ক্ষুৎপিপাসাতুর শিশুর ক্রন্দনে যে বিষাদের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাও অভাব-জন্য, আর সেই ক্ষুৎ-পিপাসা দূর হইলে শিশুর বদন-কমলে যে হাস্যের সঞ্চার দেখা যায়

তাহাই হর্ষসূচক। অভাব দূরীভূত হইলেই হর্ষের সমাগম হয়। সুতরাং জগতে অভাব-বোধই মৌলিক ও প্রকৃত। এই অভাবের মোচনই সুখ। বাসনা, তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করিতে পারিলেই সুখের উদয় হয়। ভারতবর্ষের সাংখ্যদর্শন ও অন্যান্য বৌদ্ধ-দর্শন, এই শেষোক্ত মতের সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী। ইয়ুরোপেও জর্ম্মাণ-পণ্ডিত হার্টমেন্ ও সোপেন হুঁয়ার প্রভৃতি এই মতাবলম্বী।

জীবিত থাকার বাসনার ন্যায় তীব্রতরা আর কিছুই নাই। সুতরাং এই বাসনা দূরীভূত না হইলে প্রকৃত সুখের উদয় হয় না। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-নীতি, সম্পূর্ণরূপে এই তৃষ্ণা, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত। কিন্তু বাসনা ফুরায় না, জিজীবিষারও শেষ নাই। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি সুখ হইতে পারে, দুঃখ বাসনামূলক হইতে পারে, কিন্তু সুখান্বেষণ যে মানবের পক্ষে অতি স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং যাহাতে সুখের বৃদ্ধি হয়, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নহে। সুখের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সুকর না হইলেও সুখের উপাদান নির্ণয় তত সুকঠিন নহে।

এই সুখোপাদানের বিষয় আলোচনা করার পূর্ব্বে দেখা যাউক, যে জগতের প্রচলিত জীবনের দুঃখ বাহুল্য ও সুখবাহুল্য প্রতিপাদক মতদ্বয়ের কোন্‌টি অবলম্বনীয়। আমাদের মতে ইহার কোনটি বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। ঘাত ও প্রতিঘাত, সংঘর্ষ ও সংগ্রামই জীবন, সুখদুঃখ এই ঘাতপ্রতিঘাত প্রভৃতির ফল, জীবন

সুখবহুল কি দুঃখবহুল, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য; পরস্পর বিরোধী শক্তি সংঘর্ষে সুখদুঃখ রূপ ফলের উৎপত্তি। যাহাতে জীবনী শক্তির সঞ্চয় ও জয়, তাহাই শুভ ও সুখাবহ; যাহাতে সেই শক্তির উপচয় ও পরাজয় তাহাই দুঃখাবহ। জরা, মৃত্যু, আধি ব্যাধি প্রতিনিয়ত জগতে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করা ও সেই সংগ্রামে জয়লাভ করাই জীবন।

সুখের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে মানব-জীবনকে তিন ভাবে দেখিতে হয়; প্রথমতঃ ব্যক্তিগত জীবন; স্বাস্থ্য, শারীরিক বল, সৌন্দর্য্য, শারীরিক প্রকৃতি, নৈতিক চরিত্র, বুদ্ধি ও শিক্ষা ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ মানবের বিষয়-বৈভব। তৃতীয়তঃ তাহার সামাজিক জীবন; অর্থাৎ খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মান সম্ভ্রম ইত্যাদি। সমস্ত দিক্ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিই সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যিনি জন্মাবধি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, তাঁহার সুখ কোথায়? তিনি অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও দুঃখী, রাজ-সিংহাসনও তাঁহার নিকট সুখকর নয়। যাহার ক্ষুধা নাই, সুখাদ্য তাহার নিকট অপ্রীতিকর; যাহার পিপাসা নাই, সুপেয় তাহার নিকট অনাদরের; যাহার হৃদয়ে প্রফুল্লতা নাই, জগতের শোভা সৌন্দর্য্য তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং এ কথা স্বীকার্য্য যে, মানবের সুখদুঃখ বহুল পরিমাণে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ভর করে। জগৎকে যিনি যে ভাবে দেখিবেন জগৎও তাঁহার নিকট সেইভাবে প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং জগতের সুখ

দুঃখ যখন এতাধিক পরিমাণে আপনার উপর নির্ভর করে, তখন মানবের সুখও যে অনুশীলন সাপেক্ষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্"। সুতরাং শরীর যথাবিধি রক্ষণীয়। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্ম-জীবনকেই জীবন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেও শারীরিক স্বাস্থ্য উপেক্ষনীয় নহে। দেহাতিরিক্ত আত্মার বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেও মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে দৈহিক সুখ ও স্বাস্থ্য যে প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যে ধর্ম্মশাস্ত্রে ও যে নীতিশাস্ত্রে শরীর রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত না হয়, সে একদেশদর্শী ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন কদাপি পালনীয় নহে। হিন্দু-ধর্ম্মনীতির মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য এই স্থলে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যদিও প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের দোহাই, কিন্তু যে কার্য্যে স্বাস্থ্য ও শরীরভঙ্গ হয়, সেই প্রকার কোন কার্য্যই শাস্ত্রানুমোদিত নহে। উপযুক্ত আহার, যথেষ্ট ব্যায়াম, প্রচুর নিদ্রা, সময়োপযোগী বস্ত্রাদির ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত। শারীরিক বলও এই স্বাস্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রোগযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বলীয়ান্ হওয়ার আশা নাই। আর আমরা দৈহিক শোভা সৌন্দর্য্য যাহাকে বলি তাহাও অনেকাংশে স্বাস্থ্যমূলক। সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিই সুন্দর। যাহা বর্দ্ধিষ্ণু, তাহাই সুন্দর। যৌবনে সকলই সুন্দর, মানবদেহ যখন পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার শোভার বিকাশ। শারীরিক প্রকৃতিও স্বাস্থ্যমূলক। যাহার দেহ ক্লিষ্ট, ব্যধিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল, তাহার স্বভাব কোপন; আর যাহার দেহ

বলিষ্ঠ ও সুস্থ, তাহার স্বভাব কোমল ও অনুগ্র। তারপরে নৈতিক চরিত্র, বুদ্ধি ও শিক্ষা। আমরা যাহাকে চরিত্র বলি, তাহা কতকগুলি অভ্যাস সমষ্টি; সুতরাং যাহাতে সৎকার্য্যে, সচ্চিন্তায় ও সদাচরণে অভ্যস্ত হইতে পারি তাহাই সুশিক্ষা।

সুখ
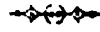
দ্বিতীয় প্রস্তাব

"সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাং,
কুতস্তদ্ধন লুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং।"

আমরা সুখের প্রকৃতি সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা দুঃখের অভাব বৈ আর কিছুই নয়। আর ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, দুঃখ প্রায় সমস্তই বাসনামূলক। শরীরজ দুঃখের কথা ছাড়িয়া, মানসিক দুঃখের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাসনা সংযতা হইলে, কামনা বশীভূতা হইলে ও প্রবৃত্তি-স্রোত নিয়মিত হইলেই দুঃখের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং যাহাতে দুঃখের নিবৃত্তি, তাহাতেই সুখের উৎপত্তি; সুতরাং যিনি যে পরিমাণে ইচ্ছাশক্তি ও প্রজ্ঞাদ্বারা আত্মার উপরে আত্মার শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য্য হন, তিনি সেই পরিমাণে সুখী। ইহা হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় যোগ-শিক্ষা ও সন্ন্যাসধর্ম্মও এই আত্মশাসন-প্রতিষ্ঠার উপায়ীভূত বলিয়া অনুশীলিত হইয়াছে। পারলৌকিক সুখ ও শান্তি সম্ভোগের জন্যই যে কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত ও যোগানুষ্ঠান প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে

তাহা নহে। সুখের উৎপত্তি ও দুঃখের বিলয় করেই ইহার অনুশীলন; সুতরাং আমরা স্বাস্থ্য প্রভৃতি যে সমস্ত সুখের উপাদান ও উপকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক যোগশিক্ষার্থী ও যোগমার্গাবলম্বী স্বীকার করিয়া থাকেন। যিনি রুগ্ন, ব্যাধিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, তাঁহার ইচ্ছা-শক্তিও দুর্ব্বলা, তাঁহার প্রজ্ঞা ক্ষীণা। শরীর ও মনের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের প্রতি যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের দর্শন সীমাবিশিষ্ট। জড়বাদ, অধ্যাত্মবাদ, প্রভৃতি দার্শনিক কোন মতেই এই অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ উপেক্ষা করিতে পারে না। যখন শরীর সুস্থ, মন কেমন প্রফুল্ল! তখন জগতের সমস্ত পদার্থই শোভন ও কমনীয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাহ্যিক সহস্র অভাবও উপেক্ষিত হয়। এই শোভা-সৌন্দর্য্যশালিনী প্রকৃতি কাহার উপভোগ্যা? এই জড় চেতনসম্পন্না বসুমতী কাহার করায়ত্তা? চতুঃষষ্টি-ললিত-কলা কাহার চিত্তবিনোদনে নিয়োজিতা? শারদচন্দ্রিমার মোহন-মূর্ত্তি, জ্যোৎস্না-বিধৌতা ধরণীর অতুলনীয় শোভা কে উপভোগ করিতে পারে? নীলাকাশের গাম্ভীর্য্য, তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের বিশালতা, কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর সুমধুর সঙ্গীত, উত্তাল তরঙ্গময় সরিৎ-পতির প্রভাব, কাহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়? যাঁহার দেহ বলিষ্ঠ, শরীর নিরাময়, চিত্ত অনাবিল, তাঁহার উপভোগের জন্যই এই বিপুল আয়োজন। আর এই হাস্যময়ী প্রকৃতি কাহার নিকট রোরুদ্যমানা? জড়চেতনবিশিষ্টা ধরিত্রী কাহার নিকট বিষতুল্যা? জ্যোৎস্নার অমল ধবল রূপরাশি কাহার নিকট ছায়াভূতা!

উদীয়মান্ বিধুবদন দর্শনে কাহার শোকরাশি উচ্ছ্বসিত হয়? মন্থরগামিনী কল্লোলিনীর কলনাদ কাহার কর্ণে অবিরাম বিষাদ-গীতি ঢালিয়া থাকে? যাহার দেহ রুগ্ন, যাহার শরীর দুর্ব্বল, যাহার চিত্তবৃত্তি শাসনাতীতা, তাহার নিকট এই সংসার দুঃখের আগার। যখন একই পদার্থ বিভিন্নরূপে ও বিভিন্নভাবে দুই ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই দুই ব্যক্তির ভিতরে এমন কিছু আছে, যাহাতে এই বিভিন্নতা ও এই পার্থক্য সংঘটিত করে। দেখা যাইতেছে যে, সুখান্বেষণের পূর্ব্বে আত্মানুসন্ধান প্রয়োজন। সুখ যদি মানবের আপনার উপরেই এতটা নির্ভর করে, তবে বহির্দেশে অনুসন্ধান না করিয়া অন্তঃপ্রদেশেই তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। গৃহে, সমাজে, জাতিতে, দেশে, কুত্রাপি সুখের সন্ধান মিলিবে না। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেই সুখের নিবাস। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই কার্লাইল বলিয়াছিলেন—“বাসনাগুলির বিলোপ করিতে পারিলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার করায়ত্ব হইবে। একত্ব, শূন্যত্ব দ্বারা বিভক্ত হইলে ভাগফল অনন্ত ও অসীম হয়।” বাসনার সম্পূর্ণ বিলোপ সম্ভাবিত না হইলেও, তাহা নিয়মিত করা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যেরই সাধ্যায়ত্ত। কোনো কোনো দ্রব্য ব্যতীত যাহার রসনা পরিতৃপ্ত না হয়, তাহার পক্ষে সেই সেই দ্রব্যের অভাবই দুঃখজনক। সুতরাং বস্তুবিশেষে যাহার রসনা আসক্তা নয়, তাহার পক্ষে এই দুঃখের উৎপত্তি অসম্ভব। যিনি সর্ব্বদা আত্মীয় অন্তরঙ্গে পরিবেষ্টিত থাকিতে চান্, তাঁহার পক্ষে নির্জ্জনবাস মৃত্যু-তুল্য। তাঁহার সুখ বাহিক

কতকগুলি অবস্থার উপরে নির্ভর করে, অথচ সেই অবস্থাগুলি তাঁহার শাসনাধীন নহে। গীতাতে যে "আত্মনা আত্মনি" তুষ্ট থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এই জন্য। যাহার সুখ, পরের প্রশংসা ও গুণানুবাদের উপরে নির্ভর করে, তিনি নিশ্চয়ই কৃপার পাত্র। আজ সমাজে আমার নিন্দাবাদ প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং আমার জীবন বৃথা—এই ভাব থাকিলে সে ব্যক্তির জীবন নিশ্চয়ই বৃথা। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, অপরের প্রশংসা লাভের প্রত্যাশায় অনেকে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রশংসা লাভ যাহার কার্য্যের উদ্দেশ্য, তাহার জীবন কখন সুখবহুল হইতে পারে না। এই কারণেই জ্ঞানিগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধির উন্মেষ করিতে ও তাহা সমস্ত কার্য্যের প্রণোদক বলিয়া মনে করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শারীর-বৃত্তিগুলি অতি সহজে তৃপ্তিলাভ করে। আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত হইয়াও অনেক সময় উদ্বৃত্ত থাকে এবং তাহা সকলেই সুখান্বেষণে ক্ষেপণ করিয়া থাকে; কিন্তু নিয়ম ও সংযম, শিক্ষা ও দীক্ষার অভাবে সেই সুখান্বেষণে দুঃখ লাভ হয়। মানসিক বৃত্তিগুলি বিকশিতা না হওয়ায়, শারীরিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া মানব অনেক সময় অতিবাহন করে। শারীরিক প্রবৃত্তিগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের তৃপ্তি অনায়াসসাধ্যা, এবং তাহাদের অত্যধিক তৃপ্তিতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের, হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদের ও আনন্দের

পরিবর্ত্তে নিরানন্দের উদয় হয়। অত্যধিক আহারে উদরাময় ঘটে, অতিনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়, অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরিচালনায় শরীর ক্লিষ্ট, ব্যথিত ও দুর্ব্বল হয়। সুরাপায়ী ব্যক্তিরা যেমন আনন্দের অনুসন্ধানে অত্যধিক সুরাপান করিয়া শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনয়ন করে, প্রবৃত্তিমার্গে নীয়মান ব্যক্তিগণও সেই প্রকার সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের অধিকারী হইয়া থাকেন, সুতরাং বিশ্রাম কাল সুখে অতিবাহিত করিতে হইলে মানব-মনের কতগুলি সাজ-সজ্জা চাই। সুশিক্ষাই সেই সাজ-সজ্জা। শিল্পামোদী শিল্পানুশীলনে, কাব্যামোদী কাব্যানুশীলনে সময় অতিবাহিত করিয়া অপার সুখ সম্ভোগ করেন।

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালং গচ্ছতি ধীমতা।

সুখ

তৃতীয় প্রস্তাব

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি; ভূমৈব সুখম্।"

শ্রুতিঃ।

উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যটি কি অসার জল্পনা? না—উহার কোন দার্শনিক ভিত্তি আছে? শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়া বর্ত্তমানকালে কেহ স্বীকার করিবেন না, সুতরাং যুক্তি দ্বারাই তাহার সারবত্তা প্রমাণ করিতে হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, "যাহা ভূমা—অর্থাৎ মহৎ ও নিরতিশয়, তাহাই সুখ—এবং যাহা অল্প বা ক্ষুদ্র তাহা সুখ নহে," পাশ্চাত্য দর্শনে সুখের এ প্রকার সংজ্ঞা কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। পাশ্চাত্য মানোবিজ্ঞানে, সুখকে আপেক্ষিক বলা হইয়াছে,—অর্থাৎ সুখ দুঃখেরই অভাব মাত্র, সুখানুভূতি দুঃখানুভূতির উপরই নির্ভর করে, সুতরাং দুঃখানুভূতি যাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহার জীবনে সুখও নাই। এই সুখদুঃখময় সংসার-জলধিতে মানব-জীবন-তরি ভাসমান। নিরপেক্ষ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও নিরপেক্ষ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে সংসারের সমস্ত সুখই দুঃখানুপ্রাণিত। কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, প্রণয়ে হতাশ, অমৃতে গরল—কবিগণ

সর্ব্বদাই উল্লেখ করিয়া থাকেন। আলো আঁধারের ন্যায়, সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণে এই জগৎ-পট উদ্ভাসিত। তাহা হইলেই দেখা গেল, দুঃখ-লেশশূন্য সুখ সংসারে নাই, দুঃখের অপনোদনে ও সুখের অনুসন্ধানেই নাকি জগতের উন্নতি, দুঃখ দূর করিয়া কিংবা কথঞ্চিৎ উপশমিত করিয়া, সুখের প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকেই কেহ কেহ জাগতিক বিবর্ত্তন প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখ পরিহারের চেষ্টা না থাকিলে, কোন প্রকারের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্ভব হইত না।

সুখের ঠিক কোন সংজ্ঞা নাই, তবে কোন কোন দার্শনিক সুখকে এই প্রকারে সংজ্ঞিত করিয়াছেন। সুখ কি? না— যাহাতে জীবন বা জীবনীশক্তি বর্দ্ধন করে; অধ্যাপক বেইন এই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়াই তাঁহার মনোবিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এবং তন্মতাবলম্বীদিগের মতে শারীরিক সুখের কথাই ভাবা যাক্, ইন্দ্রিয়-সুখ ক্ষণিক; অল্পেতেই তাহার তৃপ্তি এবং পরেই অবসাদ। সুমিষ্ট খাদ্যে রসনার তৃপ্তি হয়, সুখাদ্য আহারজনিত সুখের উদ্রেক হয়, এবং তৎপরে আর আহারে প্রবৃত্তি হয় না। অতিরিক্ত ভোজনে পীড়া বা দুঃখ জন্মে। মানসিক সুখ—যথা স্নেহানুভূতি-জন্য। স্নেহে সুখের উৎপত্তি হয় এবং দুঃখও আনয়ন করে; স্নেহের পাত্রের অভাবে কি বিনাশে যে দুঃখ হয় তাহার কথা না ভাবিলেও, স্নেহ চিরস্নিগ্ধ ও সুখকর নয়। স্নেহ, দয়া, মমতা, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা বাড়াইয়া দুঃখই উৎপাদন করে। ললিতকলার আলোচনায় অথবা তৎসৃষ্ট বিষয়োপভোগে যে

সুখোৎপত্তি হয় তাহা অন্যান্য সুখ হইতে উচ্চশ্রেণীর হইলেও, তাহা দুঃখের ছায়া-প্রাত-বিবর্জ্জিত নহে। কাব্য, সংগীত, চিত্র স্থাপত্য, ভাস্কর্য্যপ্রভৃতির অনুশীলনে ও রসাস্বাদনে যে সুখ হয়, তাহা নিতান্ত ক্ষণিক, ও পরিণামে অবসাদক না হইলেও, তাহা চিরতৃপ্তিকর নহে। যাহারা স্বাস্থ্য, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের স্নেহ ও ভালবাসাকেই সুখ মনে করেন, তাঁহাদিগের জন্য "ইমানুয়েল ক্যাণ্টের" এই বাক্যটি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

But unfortunately the conception Happiness is so vague, that although all wish to attain it, yet no one is ever able to state distinctly to himself what the object willed is ; the reason whereof is, that the elements constituting the conception happiness are cognisable *aposteriori* only, and must be inferred inductively from experience and observation ; while at the same time as an ideal of imagination, happiness demands an adsolute whole i. e, a maximum of well-being, both in my present and every future state ; and what this may in real fact and event amount to, no finite intelligence can explain, nor can he tell what it is he chooses in such volition. Is wealth the object of his desire ? How much envy and detraction may that not entail upon him ? In what perturbations may that not involve him ? Are superior parts and vast learning the object of his choice ? Such

advantages might prove but a sad eminence whence to descry evils at present hidden from his sight, or they might become a source of new and previously unknown wants ; and he who should increase in knowledge might eminently increase in sorrow. Does he choose long life ? What if it should turn out a long misery ? Or even if health were his chosen object, must he not admit that indisposition has often guarded from excess and screened from temptation, into which exuberant health might have miseld him ? In short, it is quite beyond man's power to determine with certainty what would make him happy. Omniscience alone could solve this question for him.

(The Metaphysic and Ethics
by Immanuel Kant.)

অর্থাৎ আমাদের সুখের ধারণা এত অপরিষ্কার যে, যদিচ সকলেই সুখাভিলাষী, কেহই প্রকৃত কি বাঞ্ছা করি, তাহা বলিতে পারি না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, সুখের উপাদানগুলি বীক্ষণশক্তি ও ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করে, কিন্তু মানব-কল্পনা সুখের একটা পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ধারণা করিতে চাহে—যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে বাঞ্ছনীয় হইবে। মানবের সসীমবুদ্ধি ও কল্পনা ইহা ধারণা করিতে পারে না। যদি ধনই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ইহাতে হিংসা ও দ্বেষজনিত ক্লেশ উৎপাদন করে কেন ?

ধনরক্ষার জন্যই বা উদ্বেগ ও অশান্তির উদ্রেক হয় কেন? তবে কি প্রভূত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাই বাঞ্ছনীয়? তাহাতে ত শুধু অপরিজ্ঞাত ও অদৃষ্ট দুঃখরাশিকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করে, অভিনব অভাবরাশির সৃষ্টি করে এবং দুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি করে; দীর্ঘজীবন কি বাঞ্ছনীয়? কেন, সে দীর্ঘ-জীবনও ত দুঃখময় হইতে পারে? আর যদি স্বাস্থ্যই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পীড়ায় যেটুকু সংযম অভ্যস্ত হয়, তৎপরিবর্ত্তে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যজনিত প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশতায় ও বহুবিধ অনর্থে ও অত্যাচারে লিপ্ত হইতে পারে। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানবের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে প্রকৃত সুখ নির্ণয় করা যায় না। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি, তিনিই এই প্রহেলিকার সমাধান করিতে পারেন।

আমরাও তাই বলি **ভূমাই সুখ**। অল্প ও সীমাবদ্ধ যাহা, তাহা সুখ নহে। সুখ মানবের ঈপ্সিত বটে, কিন্তু তাহা অপরিচ্ছিন্ন ও বাধিতাবস্থায় প্রাপ্তব্য নহে। পাশ্চাত্য দর্শনের শেষ কথা মহাত্মা ক্যাণ্টের বাক্যেই জানিতে পারা যায়, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে উপনিষৎকার এই সুখতত্ত্বের সমাধান করিয়াছেন।

আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

সেই ব্রহ্মই আনন্দ।

আমন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, নবিভেতি কুতশ্চনেতি।

ঋষিগণ,—কি আশার ধ্বনি তুলিয়া মানব সন্তানকে প্রকৃত সুখের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন!

অপরদিকে পাশ্চাত্য দুঃখবাদী হার্টম্যান ও সোপেনহুঁয়া বলিতেছেন—"সুখের আশা নাই,—সভ্যতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত দুঃখ বাড়িতেছে। সুতরাং জীবন শূন্যে সমাহিত কর। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ কর।" অস্মদ্দেশীয় বৌদ্ধ মতও অনেক পরিমাণে এই শ্রেণীর। এই নিরাশার বাণী একবার যাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করা বাতুলতা এবং আত্মহত্যাই তাহার পক্ষে মোক্ষ। এই প্রকার মতের প্রচারেই আত্মহত্যার সংখ্যা বর্ত্তমান য়ুরোপে এতাধিক বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া আর্য্যশোণিতে পরিপুষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের কামনা করিয়া, ঐ নিরাশার কথা আমরা শুনিতে প্রস্তুত নই। আমরা নিরাশাক্লিষ্ট কিংবা ভীত নই। মহর্ষি জলদমন্দ্রে আমাদিগকে অভয়বাণী শুনাইতেছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।" মায়াময় বা দুঃখময় এই সংসারে মায়া বা দুঃখ দূর করিয়া, যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে চান্ বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চান্, তাঁহারাই বলেন 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ' —সেই আনন্দই সুখ।

অল্প, সীমাবদ্ধ, বাধিত সুখের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহ, ধনধান্য-সম্পন্না ধরিত্রীকে ভীষণ মরুভূমে

পরিণত করিতেছেন। জীবনাহবে কত প্রাণীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া সর্ব্বর্দ্ধিসম্পন্না বসুমতীর শোভা ও সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে-ছেন, তাঁহারা সুখান্বেষণ করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখতত্ত্বের উদ্ধার না করিয়া সুখ ও শান্তির পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের "সুখ" সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভ্রান্ত ও ক্ষুদ্র ধারণা হইতেই সর্ব্বশোভাসম্পন্না, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, হাস্যময়ী, স্নেহশীলা প্রকৃতি—কি নিষ্ঠুরা, কি ভয়ঙ্করী কি প্রলয়ঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মানা হইতেছেন! জাতির জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন নাকি অহরহঃ উৎসর্গীত হইতেছে; তোমাকে বলিদান দিয়াও যদি জাতিকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে। শাণিত-কৃপাণ হস্তে, রণরঙ্গিণী মা ভৈরবী মূর্ত্তিতে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া মা ছিন্নমস্তার রুধির-পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু আমাদের মা জগন্মনমোহিনী, শান্তিরূপা, স্থিতিরূপা, অভয়দাত্রী; মার হাস্য চিরবিরাজমান, আমাদের জন্য মার বক্ষ হইতে পীযূষধারা প্রতিনিয়ত ঝরিতেছে, মা আনন্দময়ী, মা-ই আনন্দ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

আমাদের আনন্দময়ী মা ক্ষান্তিরূপা, জাতির কল্যাণদায়িনী, ব্রীড়াময়ী, শান্তিরূপিণী, কমনীয়কান্তিবিশিষ্টা, ধন-ধান্যদায়িনী, সম্পূর্ণরূপে অভয়দাত্রী। যদি অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাও, তবে মরীচিকা-ভ্রমে নিপতিত হইবে, তৃষ্ণাও দূর হইবে না; কেবল জলের পরিবর্ত্তে বালুকারাশিই লাভ করিবে। সুখাভিলাষী হও ত বৃহৎ ও মহানের অনুসরণ কর, 'নাল্পেসুখমস্তি।' ইতস্ততঃ, যেখানে সেখানে সেই সুখের বা আনন্দের অনুসন্ধান করিলে চলিবে না; যথাস্থানে সেই পরম পদার্থ খুঁজিতে হইবে, পাশ্চাত্যেরা যাহাকে সুখ বলেন, তাহা সর্ব্বস্থানে প্রাপ্তব্য নহে। অন্নময় কোষে, মনোময় কোষে, প্রাণময় কোষে কি বিজ্ঞানময় কোষে তাহা পাইবে না। আনন্দময় কোষেই আনন্দ মিলিবে, অন্যত্র নহে। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত মানবের সর্ব্ববিধ বৃত্তিনিচয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ ও স্ফূর্ত্তিকেই সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার মতের অসম্পূর্ণতা ও সুখ-তত্ত্বের সমাধান সম্বন্ধে অসমীচীনতা, উদ্ধৃত মহামতি ক্যাণ্টের কথাতেই

প্রতিপন্ন হইবে। সুখের অনুশীলন ও সুখ এক কথা নহে। সুখ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্ববিধ অনুশীলনের প্রয়োজন; কিন্তু চরম লক্ষ্য সেই আনন্দ। সুখের স্বরূপ জানিতে হইলে জ্ঞান-মার্গই প্রকৃষ্ট।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভেহ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ ইতি।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

যিনি এই আনন্দের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 'আমি কেন, সাধুকর্ম্ম করি নাই, আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিয়াছি?' এই চিন্তা তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না। অতএব হে মানব, সর্ব্বতোভাবে সেই ভূমা ও মহানের অনুবর্ত্তী হও; আনন্দঘন সেই পরম পদার্থ লাভ হইবে।

অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার

প্রথম প্রস্তাব

"বারেক এখনও কিরে দেখিবি না চাহিয়া—
উন্নত গগন 'পরে
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতিঃ ধরিয়া।"

হেমচন্দ্র।

এই যে জগত ব্যাপিয়া একটি স্রোত প্রবহমান, সেটি কি? এই যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় একটি হুহুঙ্কার, ওটি কার? ঐ যে গগন থালে কোটি কোটি নক্ষত্র জ্বলিতেছে, উহারাই বা কে? আর এই ভারতবর্ষ, ইহারই বা এ দশা কেন? স্রোতের পরিবর্ত্তে নিস্পন্দতা ও নিশ্চলতা, হুহুঙ্কারের পরিবর্ত্তে কাতর-ক্রন্দন, আর তারকা-রাজির পরিবর্ত্তে ঘনান্ধকার, ইহাই বা কেন? পৃথিবীর সমস্ত জাতিই যেন কি এক পুণ্যভূমির সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিয়ত গতিশীল। অনন্ত উন্নতি—অবিরাম গতি। সেই স্রোতই উন্নতি-স্রোত, আর ঐ যে গগনভেদী হুহুঙ্কার, উহাই মানবজাতির জয়রব।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সভ্য জগতে আলোক প্রদান করিতেছে। কিন্তু ভারত-সমাজ নির্জীব ও মৃতপ্রায়! না

আছে আকাঙ্ক্ষা, না আছে উদ্যম, না আছে আশা, না আছে উৎসাহ! এই জড় ভাবের কারণানুসন্ধান করিলে একটী কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে উদয় হয়। যাঁহারা কর্ম্মফল-বাদী, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে বর্ত্তমান জীবন নিয়মিত হইতেছে, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের উদ্যমশীলতা কখনই সম্ভবে না। আমরা দর্শন ও যুক্তির কথা বলিতেছি না। "কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না," এই মূলতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছি না; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যাঁহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকেন, দৃষ্ট বর্ত্তমানের উপর তাঁহাদের আধিপত্য যে নিতান্ত অল্প, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অদৃষ্ট-বাদে শান্তি দিতে পারে, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু জীবনের কার্য্য সমাধান করিবার পক্ষে এই অদৃষ্টবাদের ন্যায় শত্রু আর নাই।

এই অদৃষ্টবাদ হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত, নিষ্ক্রিয়তা সেই অদৃষ্ট-বাদেরই ফল। যেমন জল বায়ু, তেমন মতি গতি। আর অন্য দেশে ও অন্য সমাজে কি দেখিতে পাই? পুরুষকারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাঁহাদের আশার সীমা নাই, উৎসাহের শেষ নাই, অধ্যবসায়ে কদাপি শ্লথ-ভাব নাই। তাঁহারা ভাবেন, 'অতীতের' উপর কোন হাত নাই, কিন্তু 'বর্ত্তমান' আমাদের। তাঁহারা ভূতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতকে গঠিত ও নিয়মিত করিতে চান্। "আমি ইহা করিতে পারি, সুতরাং আমাকে ইহা করিতে হইবে।" এই তাঁহাদের মূলমন্ত্র, না করিলে প্রত্যবায় ভাগী

হইতে হয়। তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই এক মূল নীতির অন্তর্ভূত—"**কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর।**"

কর্ত্তব্য কি?—সেই জগৎব্যাপী উন্নতির স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া, সেই হুঙ্কারে যোগদান করা, আর সেই জ্ঞানালোকে অভিসিঞ্চিত হওয়া। চাই কি? অর্থ? বেশ। অর্থোপার্জ্জনের অসংখ্য উপায় বর্ত্তমান আছে, তাহার যে কোনোটী অবলম্বন কর। চাই কি? রাজনৈতিক সম্পদ্? চেষ্টা কর, যত্ন কর, আন্দোলন কর, অচিরে সম্পদ্শালী হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা যদি এযাবৎ কোন শুভ ফল উৎপাদিত না হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণই বিশ্বাসের অভাব। কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক লোকই চলিয়া থাকেন। চাই কি? সমাজ সংস্কার? আপনার গৃহ সংস্কার কর, সমাজ অচিরে সংস্কৃত হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের যতগুলি পন্থা তুমি দেখিতে পাও, তাহার কোনো একটি অবলম্বন কর। এই কর্ত্তব্যপরায়ণতাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমস্ত উন্নতিশীল জাতির প্রধান লক্ষণ। ইহার অভাবই আমাদের অধঃপতিত জাতির ক্রমাবনতির প্রধান কারণ। "সাধনায় সিদ্ধি" লাভ ঘটে, একথা ত এদেশেরই প্রাচীন কথা, তথাপি সাধনায় অবহিত না হইয়া সিদ্ধি লাভের কামনা করা কি বাতুলতা নয়? যদিও গীতার শিক্ষা এই যে—"নিয়ত কর্ম্ম কর, কর্ম্ম ফলের প্রতি কদাচ লক্ষ্য করিও না," তথাপি এদেশে কর্ম্মশীলতার একটু আভাষও পরিলক্ষিত হইতেছে না। যাঁহারা পুরুষকারে শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মশীলতা কি প্রকারে সম্ভবে? অদৃষ্টনেমীর

আবর্ত্তনেই যাঁহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনাপুঞ্জ সংঘটিত হয়,তাঁহাদের 'কর্ত্তৃত্ব' 'কর্ত্তব্য বোধ' ও 'আত্মনির্ভরের' স্থান কোথায়? দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিচারে আত্মার কর্ত্তৃত্ব কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কি জাতীয় জীবন, সর্ব্বত্রই এই কর্ত্তৃত্ব বোধ হইতেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ও ক্রিয়াশীলতা উদ্ভূত হয়। ঐ যে তেজোদৃপ্ত রণমদে-মত্ত, ব্রিটিসবাহিনী সুদূর আফ্রিকায়, প্রাচীন চীনে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে স্বদেশের হিত কামনায় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে; ঐ যে বিপদ সঙ্কুল ভূগর্ভে সহস্র সহস্র নরনারী খনিজ পদার্থ উত্তোলনজন্য অবিশ্রান্ত খাটিতেছে,আর ঐ যে বৈজ্ঞানিক, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী-আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে, তাহারা সকলেই বিশ্বাস করে যে তাহারা সিদ্ধি লাভ করিবে; এবং সেই সিদ্ধি দূরবর্ত্তিনী হইলেও তাহারা কর্ত্তব্য-বোধে অভীপ্সিত কার্য্যে বিনিযুক্ত হয়। সম্মুখে যে কার্য্য করণীয় দেখিতে পাইবে, তাহাই করিবে, সেটি উপেক্ষা করিলেই কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট হইলে,—ইহাই পাশ্চত্য জগতের শিক্ষা। মহাজ্ঞানী কার্লাইলও এই নীতি শিক্ষা-দান-কল্পে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সমস্ত সভ্য জগত এই নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সমস্তই ঐ মূল তত্ত্বে নিবদ্ধ।

অদৃষ্ট যাহা, তাহা তোমার কি? তাহাতে ত আর তোমার হাত নাই! তবে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? সকল দেশেই কেমন একটা জীবনী শক্তির প্রভাব ও

ক্রিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু কেবল ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূখণ্ডে, মৃত্যু যেন তাহার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে। এখনও একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতেছ না যে, কি দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে ইয়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় গমন করিতেছে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!" হে ভারতবাসী! ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভান করিয়া আর আলস্যের প্রশ্রয় দিও না। প্রাচীন গৌরবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানকে ভুলিও না। যদি আধ্যাত্মিকতা থাকে ভালই—কিন্তু জড় জগতের উপর আধিপত্য ও প্রাধান্য সংস্থাপন করিলেই ত আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পাইবে। প্রাচীন গৌরবের সহিত নবীন গৌরব মিশ্রিত হইলেই ত গৌরবান্বিত হইবে। সুতরাং আর অদৃষ্টের কথা তুলিও না। আর কর্ম্মফল কর্ম্মফল বলিয়া চীৎকার করিও না। কার্য্য কর, উন্নততর জাতির পদানু-ক্রমণ কর। নূতন বর্ষে, নূতন শতাব্দীতে, নূতন যুগে, নূতন রাজত্বে, নূতন উদ্যম কর। নূতন অধ্যবসায় অবলম্বন কর, নূতন আশা হৃদয়ে পোষণ কর, তাহা হইলেই এ জড়ভাব বিদূরিত হইবে। মৃত্যুর পরিবর্ত্তে নব-জীবনের অভ্যুদয় হইবে। তবেই **ভারত প্রবুদ্ধ** ভারত হইবে।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, জড়ভাবে জীবন যাপন করাই আমাদিগের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। ধীমান্ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই অদৃষ্টবাদ এবং জড়ভাব অলক্ষ্যে আমা-দিগকে ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত করিতেছে। 'আমার নিজের কিছু

করিবার নাই—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে,' এই কথা মনে করিয়া এ দেশের শক্তিশালী শিক্ষিত পুরুষগণের চরিত্র ও কার্য্য-কলাপ দিন দিন এমনই নারীজনোচিত হইয়া পড়িতেছে যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের বাহুবলের উপর—নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে না শিখিয়া, জীবনোপায়ের জন্য ব্যাকুলভাবে অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে, স্বতঃই প্রাণে অবসাদ এবং জড়তা উপস্থিত হয়। আমাদের দেশের রমণীগণ সাধারণতঃ সমস্ত কঠিন কার্য্য হইতে দূরে থাকেন বলিয়াই, তাঁহাদের মধ্যে এই জড়তা এবং অবসাদ অত্যন্ত অধিক। যুগ-যুগান্তরব্যাপী জড়তার ফলে ভারতীয় নারী-সমাজ এমনই অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন যে, কর্ম্ম-ক্লিষ্ট ভারতবাসী কস্মিন্‌কালেও কোন বিষয়ের জন্য মুহূর্ত্তের তরেও গৃহলক্ষ্মীদের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। কোন প্রকার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না আসিতে আসিতে এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, একটু কিছু হইলেই আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন। মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে যত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে, ততই তাহার প্রাণে বলের সঞ্চার হয়। যাহারা কোলাহল-মুখরিত বিশ্ব সংসারের অন্তরালে মুদ্রিত-নেত্রে দিবারাত্রি আরাম উপভোগ করেন, তাহারা যে একটু কিছু নূতন হইলেই কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দিবারাত্রি 'হা হতোস্মি' করিতে করিতে আমাদিগের চরিত্রও যে নারীজনোচিত হইয়া যাইতেছে, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের পুঁথিগত বিদ্যা বিস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদিগের অদম্য উৎসাহ অথবা জীবন সংগ্রামের চেষ্টা আমাদিগের মধ্যে আদৌ আসিতেছে না। ভারতবর্ষ দিন দিন দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষাও বাড়িতেছে, কিন্তু তৎপূরণকল্পে যতখানি চেষ্টা এবং উদ্যোগ প্রয়োজন তাহা বাড়িতেছে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকগণ পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে বিলাস বাসনা প্রভৃতি বাড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারেন নাই। চির-প্রচলিত প্রথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া, চাকুরীর চেষ্টাই আমাদিগের প্রধান কার্য্য এবং এই কার্য্যে বিফলমনোরথ হইলেই আমাদিগের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশের অভাব আকাঙ্ক্ষা এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সকলেই চাকুরী করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করাই বাতুলতা। অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বৎসর বৎসর যতগুলি লোক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে উপাধি লাভ করেন, কেবল তাঁহাদিগের উপযুক্ত চাকুরী যোগাইতে গেলেও ইংরেজ রাজাকে দেউলিয়া হইতে হইবে। সুতরাং চাকুরী করিয়া যে সকলে জীবনোপায়ের পথ করিতে পারিবেন সে আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

এক্ষণ বিচার্য্য এই যে, চাকুরীর পথে অর্গল পড়িলে কোন্ উপায়ে আমাদিগের অভাব দূর হইতে পারে? শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে আমরা যেমন ইংরেজের অনুকরণ করিতেছি, তদ্রূপ এ বিষয়েও তাঁহাদিগের অনুকরণ প্রয়োজন। এই বিশাল পৃথিবীর যে কোন স্থানে যাও, তথায়ই দেখিবে যে, ব্রিটন-নন্দন কার্য্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে। নিজের বাড়ী, ঘর, পরিবার ও পরিজনের প্রতি মমতা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। ইংরেজও মানুষ, সুতরাং তাঁহারও এ মমতা আছে। নিতান্ত বিপন্ন না হইলে কেহ বাড়ী, ঘর ত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, অর্থের চেষ্টায় বিদেশে বাহির হয় না। ইংরেজ যে নিতান্ত সাধ করিয়া নিজের ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া সুন্দরবনের জঙ্গলে আসিয়া বাস করিতেছে তাহা নহে। দেশে জনসংখ্যা পরিপোষণের উপযোগী প্রচুর অর্থ না থাকাই ইংরেজের বিদেশে আগমনের প্রধান কারণ। ঘরে বসিয়া থাকিলে কিছু পেট ভরিবে না অথবা আকাশের দিকে তাকাইয়া 'হা হতোস্মি' করিলেও জঠরানল নিবৃত্ত হইবে না! ইংরেজ এই কঠোর সত্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতের সর্ব্বত্রই অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র করিয়া লইয়াছে এবং তজ্জন্যই আজ ইংরেজ জাতি জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি।

ভারতবর্ষে দারিদ্র্য যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে এখন আর চির-প্রচলিত প্রথানুসারে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিলে কিছুতেই চলিবে না। 'অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে' মনে করিয়া জড়ভাবে দিন কাটাইলে অচিরেই দেশের ভয়ানক দুর্দ্দশা

উপস্থিত হইবে। 'অঋণী অপ্রবাসী' থাকিয়া জীবন কর্ত্তন করিতে পারিলে তাহা যে খুবই সুখের হয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আদৌ সম্ভব নহে। এক্ষণ 'অপ্রবাসী' থাকিলে আর 'অঋণী' থাকা বড় সম্ভব নহে। সুতরাং **পুরুষকার** আশ্রয় করিয়া জড়তা দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মুখরোচক পর-নিন্দায় কালাতিপাত করিলে অচিরে জঠর-জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে হইবে।

নারীজনোচিত ভীরুতা ত্যাগ করিয়া যত দিন না আমরা উন্মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইতে পারিব, তত দিন কিছুতেই দেশের অভাব দূরীভূত হইবে না। জীবন সংগ্রাম ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং এক্ষণ আর অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কিছুতেই চলিবে না। এখন আমাদিগের চাই—**পুরুষকার, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম।**

অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা অদৃষ্টবাদী। অদৃষ্টবাদ আমাদের অস্থি-মজ্জাগত। কি সাহিত্যে, কি ধর্ম্মগ্রন্থে, কি লোকাচারে, কি জনপ্রবাদে, সর্ব্বত্রই অদৃষ্টের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। অন্যদেশে কি অন্য সমাজে যে অদৃষ্টবাদ নাই, তাহা নহে; কিন্তু অদৃষ্টবাদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও অখণ্ডনীয় প্রভাব ভারতবর্ষে ও ভারতীয় সমাজে যে প্রকার পরিস্ফুট দেখিতে পাই, অন্য কুত্রাপি সে প্রকার দেখিতে পাই না। ইহার কারণানুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে, এ কথা বলা আবশ্যক যে, ঘোর অদৃষ্টবাদের মধ্যেও এদেশে পুরুষকারের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ,
তদ্বৎ পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।

যেমন একটি চক্রদ্বারা রথের গতিক্রিয়া সাধিত হয় না, উহাতে দুইটী চক্রই সমভাবে আবশ্যক হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতিরেকে কেবল দৈব সহায়ে ফলসিদ্ধি হয় না।

ইহাও উক্ত হইয়াছে যে,—

উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

উদ্‌যোগী পুরুষ-সিংহই লক্ষ্মীমান্ হইয়া থাকেন, আর কাপুরুষ-গণই ভাগ্যপথ চাহিয়া থাকে। অতএব ভাগ্যের উপর কি অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করিয়া, আত্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ কার্য্য কর, তাহাতেই ফলসিদ্ধি হইবে, যদি না হয় তবে তাহাতে দোষ কি ?

ঘোর অদৃষ্টবাদে নিমজ্জমান অলস ও যত্নহীন ব্যক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা। অদৃষ্টবাদ যে কেবল দুর্ব্বল-চিত্ত, চিন্তা-পরিশূন্য নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণেরই আশ্রয়স্থল, তাহা নহে ইহারও দার্শনিক ভিত্তি আছে ; ভারতের যে কোন মতই হউক তাহা ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক, কোন না কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকেরা সেই উচ্চ দার্শনিক আলোচনা এবং গবেষণার ধার না ধারিলেও, উচ্চ দার্শনিক ভিত্তি হইতে সমুদ্ভূত নিম্নভূম সমাশ্রয়ী পঙ্কিল মত-স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়া থাকে, ইহাতে তাহারা রোগে, শোকে, দুঃখে অনেক শান্তিলাভ করে, এবং দুর্ব্বিসহ জীবনের ভার কোন প্রকারে বহন করিয়া থাকে। অদৃষ্টবাদের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোন আলোচনার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে,

এই মতের বহুল প্রচারের বিশেষ কোন কারণ আছে কিনা? তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানব, জীবন প্রহেলিকার সমাধান-কল্পে বহু আয়াস ও চেষ্টা করিয়াছে। বলিতে কি, অসভ্য ও অশিক্ষিত অবস্থা হইতে সুসভ্য অবস্থায় পদার্পণ করিয়াই মানব, প্রকৃতির এই রহস্যের উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এ রহস্য কদাপি উদ্ভিন্ন হইল না। যাহা চিররহস্যময়, যাহা অজ্ঞেয় অথবা দুর্জ্ঞেয়, তৎপ্রতি মানব-বুদ্ধি প্রধাবিত হয় কেন? বুদ্ধির দৌড় যতটুকুই হউক না কেন, বুদ্ধির প্রসার যত সীমাবদ্ধ হউক না কেন, ইহার প্রকৃতিই রহস্যের প্রতি ধাবমান হওয়া। 'উদ্বাহুরিব বামনঃ' মানব-বুদ্ধিও জ্ঞান-চন্দ্র ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা এক কথা এবং রহস্যোদ্‌ঘাটন আর এক কথা। বালক যেমন দ্রুতগামী শকটের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, কিছুকাল পরে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে, মানব-বুদ্ধি-শিশুও সেই প্রকার সংসার-শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া অতিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় যে কোন আশ্রয় পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। মানব বুদ্ধির পক্ষে অদৃষ্টবাদই অনেকটা সেই আশ্রয়-ভূমি। বিচার ও তর্কে যাহার মীমাংসা হইল না, তাহা বুদ্ধির অতীত, সুতরাং তাহা দুর্জ্ঞেয় ও দুর্ব্বোধ্য। তাহা পরিদৃশ্যমান্ জগতের কিছু নয়, তাহা দৃষ্ট নয়, সুতরাং অদৃষ্ট। তাহাকে দৈবই বল, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলই বল, আর প্রাক্তনই বল, সমস্তই অদৃষ্ট, অননুভূত ও অপ্রমেয়। অদৃষ্টবাদের এই আশ্রয়-দান ক্ষমতাই ইহার বহুল প্রচারের প্রধান কারণ। ইহা অন্ধের যষ্টি, দুর্ব্বলের বল, স্বল্পবুদ্ধি মানবের রহস্য-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ও বিশ্রাম স্থল।

কেহ কেহ এদেশের জল বায়ু. এদেশের শ্রম-বিমুখতা, এদেশের অনায়াস-লভ্য শস্যাদি, এদেশের নিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবকেই এই অদৃষ্টবাদের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'পুরুষকারঃ প্রযত্নঃ' পুরুষকারের অর্থ যদি যত্ন হয়, তবে যে জল বায়ুতে যত্নের ও উদ্যমের অভাব সূচনা করে, সে জল বায়ুতে অদৃষ্টবাদের পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণ পরিণতিরই বিশেষ সম্ভাবনা। অদৃষ্টবাদের সপক্ষে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অবশ্যম্ভাবি ভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈর্নবাধ্যেরন্ নলরাম যুধিষ্ঠিরাঃ॥
মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং,কৃতঃ কর্ম্ম শুভাশুভং॥

পুরুষকার দ্বারা যদি অবশ্যম্ভাবী ফলের প্রতিকার সাধিত হইত, তবে নলরাজা, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির কদাপি দুঃখভোগ করিতেন না। পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম-সম্ভূত ভাগ্যফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, বিনা ভোগে কোটি শত কল্পে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও মানব জীবনকে কতকগুলি শক্তি সমবায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই শক্তি সমষ্টির মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে প্রাক্তনের স্থান আছে। যদিচ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল স্বীকার না করুন, তাঁহারাও কুলগত ও বংশানুক্রমিক্ মতিগতির ক্রিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহারা যে প্রাক্তনকে একেবারে

উড়াইয়া দিতেছেন তা নয়! আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment) বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করেন, তাহা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত **কর্ম্মফল হউক** আর নাই হউক, তাহা পুরুষকার নহে। আর তাঁহারা (Inherited tendencies) প্রাক্তন সংস্কার বলিয়া যাহা বলেন, তাহা বংশানুক্রমিক হইলেও পুরুষকার নহে। তাহা দৈব না হইতে পারে, কারণ শাস্ত্রকারদিগের মতে—পূর্ব্ব দেহার্জ্জিতং পৌরুষং দৈবং। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের মতে এই প্রকার দৈব কাল্পনিক। কিন্তু পিত্রাগত সংস্কারকেও দৈব বলিতে বিশেষ কিছু দোষ দেখা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে দর্শনের দিক্ দিয়া প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় মতেই, অদৃষ্টবাদ আংশিক রূপে সত্য। আমি সহস্র চেষ্টা ও সহস্র উদ্যম করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারি না, অপরে তাহা অনায়াসে কি স্বল্পায়াসেই লাভ করে, ইহার কারণ কি? প্রাচ্যেরা বলিবেন, দৈবই ইহার প্রতি প্রবল কারণ। পাশ্চাত্ত্যেরা বলিবেন, যে সমস্ত অনুকূল অবস্থার সমবায়ে ইপ্সিত ফল লাভ করিতে পারা যাইত, আমার পক্ষে সেই সেই অবস্থা ঘটে নাই, সুতরাং আমি অকৃতকার্য্য হইয়াছি। অপরের সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থা ঘটিয়াছিল, সুতরাং সে ফল লাভ করিয়াছে। বেশ কথা, সেই সমস্ত অনুকূল অবস্থার সংযোগ কি আমার সাধ্যায়ত্ত? তা নয়, তাহা হইলে আমার পুরুষকারের ফল কি? বলিবেন, পুরুষকারের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সেই সমস্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায়, তার বেশী আর কিছু নয়। তাহা হইলে ত পনের আনাই

পুরুষকারের এলাকা বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। সমাজ, ধর্ম্ম, দেশ ও কাল ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়, কৌলিক ও পিতৃ পিতামহাগত প্রবৃত্তি ইত্যাদি অনেক পরিমাণে মানব জীবনের নিয়ন্তা, পুরুষকারের শক্তি এই শক্তি সমবায়কে কি সহজে অতিক্রম করিতে পারে? যাহাকে অজ্ঞলোকেরা অদৃষ্টবাদ বলিয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বেই অথবা অব্যবহিত পরেই বিধাতা লোকের সুখাসুখ, শান্তি অশান্তি সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, সে লিপি সাধারণ লোক-চক্ষুর অগোচর, সুতরাং সে লিপি অদৃষ্ট এবং তাহাই অদৃষ্টবাদ। তাহা যুক্তি ও তর্কের প্রবল তরঙ্গে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অদৃষ্টবাদের দার্শনিক ভিত্তির অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দু দর্শনের অদৃষ্টবাদ অনেক পরিমাণে পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম ইত্যাদি জন্মান্তরবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। জন্মান্তরবাদের দার্শনিক যৌক্তিকতা কি অযৌক্তিকতার বিষয় আলোচনা না করিয়া, আমরা পুরুষকার বা মানবের স্বাধীনেচ্ছা প্রণোদিত যত্নের ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? কার্য্য কারণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব মানব বুদ্ধির একটি প্রধান স্বতঃসিদ্ধ উপকরণ, এমন কি সে সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে বুদ্ধির কোন প্রকার ক্রিয়া বা খেলাই সম্ভবপর হয় না। তজ্জন্য ইহাকে Category অথবা মূলতত্ত্ব বলা হইয়াছে। 'আমরা যাহা' তাহারও কারণ আছে, অর্থাৎ আমরা যে অবস্থায় আছি বা আমার আমিত্ব যাহা, মিল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতে, পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ও ঘটনাবলিই তাহার 'কারণ'। কারণের এই প্রকার

সহজ ও সুবোধ্য সংজ্ঞা অনেকেই প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না, পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ও ঘটনাপুঞ্জ 'কারণ' হইলে, দিবাকে রাত্রির কারণ বলা যাইত এবং রাত্রিকে দিবার কারণ বলা যাইত; কিন্তু কারণের যে সংজ্ঞাই প্রকৃত ও উপযুক্ত বলিয়া পরে গৃহীত হউক, তাহার ভিতরে ফলোৎপাদিনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাই যে কার্য্যের কারণ, তাহা নয়; সেই পূর্ব্ব-বর্ত্তী ঘটনায় যদি ফলোৎপাদিনী শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তবেই তাহাকে 'কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জগতের আদিকারণের কথা ছাড়িয়া দিয়া 'আমরা যাহা' তাহার কারণানু-সন্ধান করা যাউক। পিতামাতা হইতে দেহ ও তৎসংনিবদ্ধ মন ইত্যাদি লাভ করি, পরিবার ও সমাজ হইতে ক্রমশঃ সেই দেহ ও মনের পুষ্টি সাধন করি, সুতরাং স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে যে, আমারা সবই Heridity পিত্রাগত ও enviroment 'পারি-পার্শ্বিক' অবস্থা-সমুদ্ভূত। আমি অবস্থার দাস, ঘটনা-স্রোতে নীয়মান্ হইয়া এদিক্ ওদিক্ চলিতেছি, আমার 'কর্ত্তৃত্ব বোধ' মিথ্যা ও কাল্পনিক, আমি কিছুই করি না। কিন্তু মোহ বশতঃই মনে হয়,—

> ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
> ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
> অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
> ঈশ্বরোঽহম্ ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোস্তি সদৃশোময়াঃ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥

গীতা।

সমস্তই আমি করি, কিন্তু এই মোহোৎপত্তির কারণ অবশ্য আছে। কর্ত্তৃত্ব-বোধকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, যদি আমার আমিত্বই মিথ্যা হয়, তবে কর্ত্তৃত্ব বোধ শূন্যে উড়িয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য ক্ষোভ করিবার কোনই কারণ নাই, এবং তাহা হইলে তর্ক যুক্তি আলোচনা গবেষণা ইত্যাদির শৃঙ্খল হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারি; কিন্তু 'আমিত্ব' বোধের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্ব-বোধ এবং তাহা হইতে সহজানুমেয় আত্মশক্তি বা পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রমতে 'দৈব'ই পুরুষকারের প্রতিকারণ এবং পুরুষকারও দৈবের প্রতিকারণ, অর্থাৎ দৈব অর্থ যদি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পৌরুষ (পূর্ব্ব দেহার্জ্জিতং পৌরুষং দৈবমিতি) হয়, তবে পুরুষকার যে দেহেই অর্জ্জিত হউক, তদ্ভিন্ন 'দৈব' ফল সিদ্ধ করিতে পারে না, অপর পক্ষে দৈব নির্দ্দেশানুসারেই পুরুষকার প্রকটিত হয়। জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করিলে আর এ মতের সমীচীনতা সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে না। জন্মান্তরবাদ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে দৈব ও পুরুষকারে এই একত্ব বুঝিয়া উঠা দায়। আমাদের দৃষ্টি যদি ইহজন্মেই সংনিবদ্ধ থাকে, তবে আর শাস্ত্রোক্ত প্রাক্তনের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। ' কিন্তু পূর্ব্বকথিত

প্রাক্তন ইত্যাদিতে কিয়ৎপরিমাণে কি সম্যক প্রকারে বিশ্বাস করা আবশ্যক হয়। তাহাদের নিকট 'দৈবনাম্ন কৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎপূর্ব্বদৈহিকং' এ কথা নিরর্থক মনে হইবে, এবং যাহার প্রভাবে নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ইত্যাদি বাক্য রচিত হইয়াছে, সে কর্ম্মফলবাদও অর্থশূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এই কর্ত্তৃত্ব-বোধের কোন মূল ভিত্তি আছে কিনা, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য-বোধই যদি মূলহীন ও কাল্পনিক হয় তবে আর পুরুষকারের অর্থ কি ? দেখা যাইতেছে যে,এই প্রসঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতা বাদ ও ইচ্ছার প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্যের অধীনতাবাদ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদদিগের মধ্যে যে সনাতন বিরোধের ভূমি আছে, সেই পিচ্ছিল ভূমিতে পদার্পণ করিতে হইল। মানবের ইচ্ছা কি স্বাধীন অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে ? না প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্যই ইহার নিয়ামক ? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এবং তৎসম্বন্ধে শত শত গ্রন্থাদিও বিরচিত হইয়াছে। যাঁহারা ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেন তাঁহারা এ কথা বলেন না যে, ইচ্ছা বিনা কারণে কোন বিশেষ দিকে প্রধাবিত হয় অথবা ইচ্ছার উৎপত্তির কোন কারণ নাই। তাঁহারা ইহাই বলিতে চান্ যে, প্রবৃত্তিই ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, কিন্তু আবশ্যক হইলে ইচ্ছাকে প্রবৃত্তিপরিচালিত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারা যায়। সে শক্তি ইচ্ছারই আছে। একই অবস্থার একই প্রবৃত্তির উত্তেজক সামগ্রী দ্বারা সকলকে এবং সর্ব্ব সময়ে কেহকে পরিচালিত করা যাইতে পারে না। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা বলেন যে, জড় জগতে

যেমন বিভিন্ন শক্তির বিভিন্নদিকে ক্রিয়া দেখিয়া সকল পদার্থের সহজে গতি নির্ণয় করা যায়, মনোজগতে সে প্রকার সিদ্ধান্ত স্বল্পায়াস সাধ্য না হইলেও, ইচ্ছা-শক্তি ও অন্যান্য শক্তির ক্রিয়া একইরূপ এবং একই নিয়মাধীন। এই মত হইতেই ঘোর জড়বাদের উৎপত্তি। তাঁহাদের মতে জড়শক্তি ও চিৎশক্তির পার্থক্য কেবল শব্দগত। এই মতের খণ্ডন জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার না করিলেও চলে, কারণ এই মতবাদীরা স্বয়ংই তাহার জীবন্ত প্রত্যুত্তর। যেমন মনন ক্রিয়া দ্বারা মনের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, তেমন কর্ত্তৃত্ব বোধ হইতে ও আত্ম-শক্তি বোধ হইতেই কর্ত্তৃত্ব ও শক্তি উপলব্ধ হয় ও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা যাহাকে শক্তি বলেন, তাহার অস্তিত্বও সেই আত্ম-শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব-বোধ হইতেই ত অনুমিত। আততায়ীদিগের স্বদেশে সমরানল প্রজ্জ্বলন যেমন সমরনীতির একটি বিশেষ কথা, তেমন এস্থলেও তাহাদের কথিত 'শক্তি' ইত্যাদির অনুমেয়ত্ব যে সর্ব্বপ্রকারে আত্ম-শক্তি-বোধ ও আত্ম কর্ত্তৃত্ব-বোধের উপর নির্ভর করে, তদ্দ্বারা তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে। আত্ম-শক্তি যদি থাকে তবে তাহার প্রয়োগও আছে, ইচ্ছাতেই সে শক্তির প্রয়োগ, শক্তি-প্রয়োগ ক্ষমতা যদি স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক হয়, তবে ইচ্ছা স্বাধীন, এবং ইচ্ছা স্বাধীন হইলে, পুরুষকারও অন্যান্য শক্তির ন্যায় কদাপি ব্যর্থ হইতে পারে না। দৈবকে অতিক্রম করিতে সর্ব্বকালে সর্ব্ব বিষয়ে সক্ষম হউক আর না হউক, পুরুষকারের প্রভাব মানব জীবনে কেহই অস্বীকার করিতে

পারেন না। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমীচীনতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দুইটি চক্র ব্যতিরেকে মানব জীবনরথের গতি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। দৈবকে যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারাও ভ্রান্ত এবং যাঁহারা পুরুষকারকে অবিশ্বাস করেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। মানব জীবনে দৈবের ক্রিয়া দেখিতে পাই বলিয়াই মানুষ কথঞ্চিৎ দেবপরায়ণ; না হইলে ধর্ম্মের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত. আর পুরুষকার না থাকিলে এই নিখিল বিশ্ব এক অপূর্ব্ব জড়পিণ্ড বলিয়াই পরিগণিত হইত—মানবের শ্রেষ্ঠত্ব, সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তই অসার জল্পনা মনে হইত, কিন্তু দৈব ও পুরুষকারের সম্মিলনে যে জীবনরথ সংসারবর্ত্মে চলিতেছে, তাহার গতি নাতি-দ্রুত নাতি-ধীর। দৈব আছে বলিয়াই মানব অহঙ্কারে স্ফীত হইতে পারে না এবং পুরুষকার আছে বলিয়াই মানব নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল জড়-পিণ্ডবৎ পড়িয়া থাকে না। ভারতের অদৃষ্টবাদ যত অশুভকর হউক না কেন, তাহার দার্শনিক ভিত্তি অবিসংবাদী। কিন্তু দার্শনিক ভিত্তিচ্যুত হইয়া ভারতের জল বায়ুতে ইহা নানাপ্রকার মহা অনিষ্টকর ফল সমূহ প্রসব করিতেছে এবং করিয়াছে। ভারতবাসীর হৃদয়ে 'দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি' এ বাক্যটির যাথার্থ্য কিছুতেই মুদ্রিত হইতেছে না। উদ্যোগ-বলে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা জগতের মুখশ্রী কি প্রকার বদলাইয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। তাঁহারাই মহর্ষির পুরুষসিংহ, সুতরাং লক্ষ্মী তাঁহাদিগকে সমাশ্রয় করিয়া আছেন।

স্মৃতি

(স্মরণ-শক্তি)

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃ ও বহির্জ্জগতের বিভেদ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, পদার্থ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য তিরোহিত হইতেছে, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলি মনোবিজ্ঞানে প্রযুক্ত হইতেছে এবং মনোবিজ্ঞানের নিয়ম ও ধারা জড়-বিজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জড় ও চৈতন্যের ভেদ-বুদ্ধি নিরাকৃত হইয়া, বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের "অদ্বৈত সিদ্ধি" সংসাধিত হইতেছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তথা-কথিত সংজ্ঞাহীন উদ্ভিদেরও এক প্রকার চেতনা আছে এবং উদ্ভিদ-স্নায়ু বাহ্যিক শক্তিবলে উত্তেজিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণের এতৎ সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল, তাহা সম্প্রতি "রয়েল সোসাইটী"র কার্য্য বিবরণী প্রকাশে, নিরাকৃত হইয়াছে। (A complete account of Prof. Bose's discovery of nervous impulse in mimosa, published

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল-শাখার তৃতীয় বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

in the Philosophical Transaction of the Royal Society.)

যে সমস্ত ক্ষমতা বা শক্তিকে আমরা সর্ব্বতোভাবে 'মানস' বা 'অধ্যাত্ম' বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জৈবিক (organic)। কোন্ কোষে (cell এ) কি ভাবে এই সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি নিহিত থাকে তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই, তবে থাকে যে—ইহা নিশ্চয়।

আমাদের আলোচ্য স্মৃতি বা স্মরণ-শক্তি যে কেবল মানব-মনেরই বিশেষ শক্তি বা বৃত্তি তাহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। ইহা জীব,উদ্ভিদ ও সম্ভবতঃ জড় জগতেও বর্ত্তমান। বংশানুক্রম (Heredity) প্রকৃত প্রস্তাবে এই কোষ-নিবদ্ধ স্মৃতি কিনা তাহাও বিবেচ্য। এই বংশানুক্রমের বা (Heredity'র) ক্রিয়া যে সমস্ত জীব-জগতে ও কিয়ৎ-পরিমাণে উদ্ভিজ্জগতেও পরিলক্ষিত হয়, তাহা অবিসংবাদী। বংশানুক্রমের নিয়ম, ধারা ও পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে; কিন্তু ইহার কারণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। মূল কারণ সর্ব্বদাই দুর্জ্ঞেয়।

পিতামাতার সংযোগে অথবা জীব-কোষ ও গর্ভ-কোষের (Sperm cell ও Germ cell'এর) সমবায়ে অপত্যোৎপাদন হয় এবং পিতামাতার দৈহিক ও মানসিক গুণ বা দোষের বিশেষত্ব (Peculiarities) সন্তানে সংক্রমিত হয়, সুতরাং যাহা কিছু সংক্রমিত হয় তাহা জীব-কোষেই থাকে,—অন্য কোথা হইতেও

তাহা আসিবার সুযোগ নাই ;—পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment) তাহার উপর ক্রিয়া করে বটে, কিন্তু তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। দেহের বিশেষত্ব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব-কোষে কি প্রকারে নিবদ্ধ থাকে, তাহা অনুবীক্ষণাদির সাহায্যেও সম্যক বুঝিতে পারা যায় না; যথা, বংশানুক্রমিক খঞ্জতা, অন্ধত্ব ইত্যাদি মানসিক বিশেষত্ব ত সে অনুবীক্ষণেরও ঈক্ষণাতীত। জীবন ও বর্দ্ধন একটি সামান্য কোষ (nucleated cell) হইতেই প্রারব্ধ, পিতার স্বভাব ও প্রকৃতি পুত্রে সংক্রমিত হইলে ঐ কোষেই তাহা সঞ্চারিত হয়। ইহাকে সেই কোষ-স্মৃতি ব্যতীত আর কি বলিব?

মস্তিষ্কের পীড়া নিবন্ধন যে স্মৃতি-ভ্রংশ হয় তাহা দেখিয়া থাকিবেন ; এবং আবার চিকিৎসা দ্বারা সে পীড়া দূরীভূত হইলে স্মৃতির উদয় হয়। এতদুপলক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন,—পীড়া বশতঃ জীব-কোষগুলি নিস্তেজ ও কিয়ৎপরিমাণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ; কিন্তু কোষ-কেন্দ্র (nucleii) যদি অপর কোষ উৎপাদন করিতে পারে তবে আবার স্মৃতির উদয় সম্ভব। নূতন কোষগুলি পুরাতন কোষগুলির গুণোপেত হয় এবং জীব-দেহের নিয়মে পুরাতনের স্মৃতি নূতনে সংক্রমিত হয়। সুতরাঃ স্মৃতি বংশানুক্রমেরই একদিক্ বটে। ("The cells may have been atrophied ; but if their nucleii generally considered as the seat of reproduction give origin to other cells, the bases of Memory are re-established, the

new cells resemble the parent cells by virtue of that tendency of every organism to maintain its type, and of every acquired modification to transmit its characteristics to succeeding forms; memory in this case is only a phase of heredity."—Ribot on Diseases of Memory. P. 201.)

একখানি মার্কিন দেশীয় মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত আছে। কোন ব্যক্তির পিতামহ পিতামহীর দাম্পত্য-জীবনের প্রথমাবস্থায়—অর্থাৎ কোন সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে, একদিন নৌকা হইতে দুর্ব্বাসা প্রকৃতি-সম্পন্ন পিতামহ, পিতামহীকে ক্রোধবশে জল-মগ্ন করিবার জন্য জলে ফেলিয়া দেয়। পিতামহী আত্ম-জীবন রক্ষার্থ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নৌকার একপার্শ্ব ধরিয়া ফেলেন। পিতামহ ক্রোধ ও জিঘাংসায় অন্ধ হইয়া স্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্য অস্ত্রদ্বারা সেই অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া ফেলেন। তথাপি কোন ক্রমে সে যাত্রা পিতামহীর জীবনরক্ষা হয়। পরে পিতামহ ও পিতামহী স্বামী-স্ত্রীভাবে আবার জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি হয়। পুত্রগুলি সকলেই অঙ্গুষ্ঠ-হীন এবং কন্যাগুলি সকলেই অঙ্গুষ্ঠ-শালিনী। ক্রমান্বয়ে এইরূপে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্রগুলির অঙ্গুষ্ঠহীনতা চলিয়া আসিতেছে। ইহাকে পিতামহের পাপ-স্মৃতি বৈ কি বলিবেন ?

স্মৃতি যে জৈবিক (Biological fact বা organic) তাহাই প্রতিপাদন জন্য এই মুখবন্ধের অবতারণা করা হইল।

অস্মদ্দেশে দর্শন-শাস্ত্রে মনোবিজ্ঞানের যেটুকু আলোচনা দেখিতে পাই তাহাতে স্মৃতির কথা এইভাবে উল্লিখিত আছে—

"বিভুর্ব্বুদ্ধ্যাদি গুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতি স্মৃতিশ্চস্যাদনুভূতিচতুর্বিধা॥

ভাষাপরিচ্ছেদ।

স্মৃতি-ব্যাখ্যা প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকার করিয়াছেন—

স্মৃতি—"অনুভূতবিষয়জ্ঞানং
অনুভবান্যসংস্কারজন্যজ্ঞানম্।"

স্মৃতি, মেধা, স্মরণ-শক্তি, ধৃতি, ধারণা-শক্তি—আমরা একই অর্থে ব্যবহার করিব।

আমাদের 'আমিত্ব' বা অহংবুদ্ধি বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই?—আমার বর্ত্তমান অনুভূতি, চিন্তা কি সংজ্ঞা এবং আমার অতীত অনুভূতি, চিন্তা ও জ্ঞান, এ সকলের সমষ্টিই আমার (Ego) 'আমিত্ব'। বর্ত্তমান, প্রতি মুহূর্ত্তেই অতীতের গর্ভে লীন হইতেছে; সুতরাং, অতীত যাহা তাহার স্মৃতিকেই বিশেষ ভাবে আমরা আমাদের 'আমিত্ব' বলিয়া থাকি, অথবা এই 'অহং বুদ্ধি' প্রায়শঃ স্মৃতিরূপা। আমি এই মুহূর্ত্তে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অনুভব করিতেছি, কি চিন্তা করিতেছি ও পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনুভব করিয়াছি বা চিন্তা করিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রত্যক্ষ করিব, অনুভব করিব ও চিন্তা করিব বলিয়া আশা করিতেছি, তাহাই কি আমার 'আমিত্ব' নয়?

ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে বলিয়া আশা করি তাহাও অতীত ঘটনা-পুঞ্জের স্মৃতির সাহায্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের এই আমিত্ব প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি।

অহংবুদ্ধির কেন উদয় হয়, তাহার কোন সমীচীন উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে—অহং-বুদ্ধি আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ; কিন্তু বর্ত্তমান অনুভূতি, চিন্তা, সংজ্ঞা ও অতীতের স্মৃতিরূপা এই যে 'অহংবুদ্ধি' বা জ্ঞান, তাহার অন্তরালে কোন স্থায়ী পদার্থ বর্ত্তমান আছে কি না, এবং থাকিলেই বা তাহার স্বরূপ কি, ইত্যাদি প্রশ্ন দর্শন শাস্ত্রেরই অন্তর্গত। আমরা এক্ষেত্রে ঠিক বিজ্ঞানের দিক দিয়া স্মৃতির আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিতে পাই যে, আমাদের 'মনঃ', 'আমিত্ব' 'অহংবুদ্ধি'—এ সকল প্রায়শঃই স্মৃতি। অতএব মনোবিজ্ঞানে স্মৃতির আলো-চনা বড়ই প্রয়োজনীয়। অপর দিকে দেখুন—আমরা যে আমা-দের জ্ঞান ও বিদ্যার এত অভিমান করি, তাহাও অনেক পরিমাণে এই স্মৃতি বা স্মরণের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের শিক্ষা, বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন স্মৃতির সাহায্যেই সংসাধিত হয়, স্মৃতির স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয়ের ধারা ও নিয়মের উপরেই সমস্ত শিক্ষা-প্রণালী (Pedagogics) নির্ভর করে। ব্যবহারিক জীবনের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়ো-জনীয়তা বড় বেশী। যাহার স্মৃতি সর্ব্বতোভাবে লোপ পাইয়াছে, তাহাকে মানুষ বলা চলে না। সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকরূপে স্মৃতিভ্রংশ হইলেও, উন্মাদ ও 'জড়ভরত' শ্রেণীর লোকের মনুষ্যত্ব

কত নিম্ন শ্রেণীর। একেবারে যাহার স্মৃতি-ধ্বংস হয়, জড়-পদার্থ ও তাহাতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ব্যক্তি যখন আর তাহার আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে বা স্মরণ করিতে পারে না, তখনই আমরা তাহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী মনে করি। সুতরাং বক্ষ্যমান বিষয়টির আলোচনার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

আমরা সচরাচর একটি বিশেষ ভুল ধারণা করিয়া থাকি। অনেক সময়ে মনে করি—স্মৃতি মনের একটি অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতা; অর্থাৎ আমরা যখন বলি যে, অমুকের স্মরণ-শক্তি বড় কম তখন মনে করি যে, তাহার কোন বিষয়েই স্মৃতি নাই বা থাকিলেও অতি দুর্ব্বল। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। এই স্মৃতি অখণ্ড বা এক নয়, ইহা বহুরূপা। অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে একজনের স্মৃতি নাই বলিয়া অন্য বিষয়েও তাহার স্মৃতি থাকিতে পারে না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সকলেই জানেন যে, কেহ কেহ নাম ও শব্দ স্মরণে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন; কিন্তু তাঁহার সংখ্যা, সময় প্রভৃতির স্মৃতি বড়ই অল্প। আবার কেহ কেহ ঘটনাপুঞ্জের সন, তারিখ, কোনো বিষয়ের সংখ্যা ইত্যাদি স্মরণে বিশেষ কৃতী; কিন্তু তাঁহার শব্দ-সম্পৎ বড়ই কম। সংগীতজ্ঞ কলাবৎ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বর-পার্থক্য স্মরণ রাখেন, কিন্তু অপর বিষয়ে একটা সামান্য কথাও মনে রাখিতে পারেন না। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা একটি অখণ্ড

শক্তি বা ক্ষমতা বলিয়া মনে করি, প্রত্যুতঃ তাহা বহুধা বিভক্ত। সচরাচর আমরা শব্দ-স্মৃতির মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন করিয়া থাকি। যিনি একবার পঠিত বিষয় অনায়াসে পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন, তাঁহার অসাধারণ স্মৃতির কতই প্রশংসা করি। কিন্তু, বাস্তবিক কি এই ক্ষমতা এতই বাঞ্ছনীয় বা প্রশংসনীয়? অনেক শ্রুতিধরের কথা আপনারা শুনিয়াছেন বা অনেককে আপনারা দেখিয়াছেনও—একবার কিছু শুনিলেই পুনরাবৃত্তি করিতে পারে; কিন্তু, উচ্চ শ্রেণীর চিন্তনে বা মননে সম্পূর্ণ অক্ষম, তুলনা করিবার ক্ষমতা হয়ত একেবারেই নাই, বিচার শক্তিরও বিশেষ কোন চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না,—রেকর্ডের সাহায্যে কলের গানের ন্যায় শ্রুত বিষয় আবৃত্তি করে, এই মাত্র। অবশ্য অনেক স্থলেই শব্দ-স্মৃতির প্রশংসা করিতে হয়, কারণ, বাক্যকে যদি জ্ঞাত বিষয়ের চিহ্ন বা প্রতিনিধি মনে করা যায়, তবে বাক্যের স্মৃতিতে সমস্ত জ্ঞাত বিষয়েরস্মৃতি হইল বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

যাহা হউক, এখন স্মৃতির অখণ্ডত্ব অদ্বিতীয়ত্ব বা একত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া ইহার স্বরূপ ও প্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

অনুভূত, জ্ঞাত ও চিন্তিত বিষয়েরই স্মৃতি;—অননুভূত, অজ্ঞাত ও অচিন্তিতপূর্ব্ব বিষয়ের স্মৃতি সম্ভবে না। যাহা কখনও দেখি নাই,তাহার স্মৃতি সম্ভবে না; যাহা অদৃষ্ট,তাহার স্মরণ অসম্ভব; যাহা অশ্রুত, তাহারও স্মৃতি নাই। যাহা কখনও অনুভব করি নাই, তাহারও স্মরণ সম্ভব নহে। কল্পনাও স্মৃতি বিষয়ের সংযোগ

বিয়োগেই সম্ভব হয়। তবে, স্মৃতি বা স্মরণ কি? যাহা দেখিয়াছি বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহা শ্রবণ করিয়াছি বা অনুভব করিয়াছি, সেই সকল বিষয়ের অনুপস্থিতি বা অভাবেও যদি সেই সমস্ত দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত বিষয় মানস-পটে উদিত হয়, তবেই তাহা স্মৃত বা তাহার স্মরণ হইল। এই আবির্ভাব বা উদয় যে নিয়ম বা শৃঙ্খলার বশবর্ত্তী, তাহা আমাদের আলোচ্য। ধরুন—আপনি কোন পদার্থ অর্জ্জন বা সঞ্চয় করিলেন, তাহা যদি রক্ষা না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন, তবে আর আপনার সে পদার্থের দর্শন ও উপভোগ অসম্ভব। রক্ষণই (Conservationই) স্মৃতির মূলে। যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, স্পর্শ বা আঘ্রাণ করিলাম, তাহা যদি সেই দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও আস্বাদন ক্রিয়ার সহিতই বিলুপ্ত হয়, তবে আর মানস-ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবির্ভাব উদয় বা স্মৃতি ঘটিবে কি প্রকারে? সুতরাং পদার্থের রক্ষণের ন্যায় দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, ঘ্রাত ও আস্বাদিত বিষয়েরও রক্ষণ আবশ্যক।

রক্ষণের কথা হইলেই সেই বিষয়গুলি কোথায় কি ভাবে রক্ষিত হইবে, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। মন যদি জড়াতীত কিছু হয়, তবে আর 'কোথায়' এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না; কারণ জড়াতীত বস্তু 'দেহাতীতও' বটে। আর যদি এই "মনঃ" পদার্থটি সর্ব্বতোভাবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতেই নিবদ্ধ থাকে মনে করেন, তবে এই রক্ষণও মস্তিস্ক ও স্নায়ুতেই ঘটিয়া থাকে। শরীর-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে বটে; কিন্তু মস্তিস্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীই যে "মনঃ" পদার্থের একমাত্র নিবাসভূমি, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

সম্বন্ধের নৈকট্য, অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা বা আপেক্ষিকতার অধিক বিজ্ঞান কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহা স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনন-ক্রিয়াই কোন না কোন রকমে মস্তিস্ক ও স্নায়ুর উপরে ক্রিয়া করে। কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে, মস্তিস্ক-স্নায়ুপদার্থে প্রত্যেক চিন্তন, মনন ও অনুভূতি প্রভৃতির প্রতিকৃতি, 'ছাপ' বা চিহ্ন রহিয়া যায়, এবং তাহাই হিন্দুদর্শনের ভাষায় 'সংস্কার' নামে বর্ণিত হইতে পারে। শরীর-তত্ত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা দ্বারাও ঠিক কোন অনুভূতি, চিহ্ন বা জ্ঞান, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুর কোন্ পর্দ্দায় কি ভাবে মুদ্রিত হয়, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। স্নায়ুপদার্থে একটা পরিবর্ত্তন হয়, কেবল ইহাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কথা ধরিয়াই অনেকে মনে করেন যে, স্মৃতির প্রকৃতি কতকটা আলোক-চিত্রের 'Sensitive plate' বা শব্দ-লেখ-যন্ত্রের স্বরলিপি-পাত্রের ('Record'এর) ন্যায়।

যে চিত্র কাগজে অদৃশ্য থাকে, তাহাই সূর্য্যালোকে দ্রব্য-বিশেষের সাহায্যে দৃশ্যমান হইয়া উঠে, এবং যে শব্দ বা সঙ্গীত-লহরী 'রেকর্ডে' ধৃত অথচ অশ্রুত থাকে, তাহাই ভ্রাম্যমান সূচীর সহযোগে শ্রূয়মান হয়। মস্তিষ্কে বা স্নায়ুতে যাহা মুদ্রিত, অথচ অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুভূত, অঘ্রাত ও অস্পৃষ্ট, অনাস্বাদিত এবং বাহ্যদৃষ্টিতে বিলুপ্ত, তাহাই ইচ্ছার ক্রিয়া বা শক্তি দ্বারা মানসপটে স্মৃতিরূপে উদিত হয়; কিন্তু স্মৃতির ক্রিয়ার সহিত আলোক-চিত্রের বা শব্দলেখ-যন্ত্রের সাদৃশ্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বড় বেশী নয়।

মাত্র 'রক্ষণ' ও মুদ্রণেই তাহা পর্য্যবসিত। স্মৃতিতে কোন বিষয়কে জাগাইতে হইলে সূর্য্যালোক ও বাহ্যবস্তুবিশেষের সাহায্যের আবশ্যক হয় না। রক্ষণ ছাড়া স্মৃতিতে যে পুনরুৎপত্তি বা পুনর্জ্জনন (Reproduction) আবশ্যক, তাহা সর্ব্বতোভাবে আভ্যন্তরিক উপায়েই সংসাধিত হয়। মানব-স্মৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে 'জৈবিক'। দেহের, সুতরাং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর স্বাস্থ্য ও অবস্থার উপরে স্মৃতির প্রাখর্য্য বা শক্তি নির্ভর করে। বাল্যে ও যৌবনে স্মৃতির প্রখরতা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং বার্দ্ধক্যে তাহার শক্তিহীনতা ও নিস্তেজ ভাবও দেখিয়াছেন। এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও ইহার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। নিদ্রাপগমে প্রভাতকালে স্মৃতির তীক্ষ্ণতা ও অপরাহ্নে তাহার স্বল্পতাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এইজন্যই পাঠ্যাভ্যাসের জন্য প্রভাতই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়,—যাহা মুখস্থ করিতে হইবে, এরূপ পাঠ ছাত্রগণ প্রাতঃকালেই সমাপন করে।

অতীত ও আপাত-দৃষ্টিতে লুপ্ত ও সুপ্ত অনুভূতি, চিন্তন, মনন প্রভৃতির পুনর্জ্জননই (Reproduction'ই) স্মৃতির বিশেষ কার্য্য। কখন কি ভাবে তাহার প্রথম উদয় হইয়াছিল—তৎস্থানে স্থাপন (Localisation) তাহার পরে। মোটামুটি যাঁহারা মনে করেন যে, মস্তিষ্কের স্থান বা স্তরবিশেষে অনুভূত ও চিন্তিত বিষয়ের পূর্ব্বকথিত মুদ্রণ কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারেন না; বস্তুতঃ তাঁহাদের এই মত অনেক পরিমাণে কল্পনা-প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক

বেইন্ এতৎসম্বন্ধে একটি মত উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বেশ সমীচীন ও যৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন—স্মৃত বা পুনর্জ্জাগরিত অনুভূতি ইত্যাদি যে ভাবে যে স্নায়ুপথে মস্তিষ্কদেশে অনুভূত হইয়াছিল, ঠিক সেইপথে বা দেশেই উপস্থিত হয় এবং সেই একই স্নায়বিক ক্রিয়াই সম্পাদন করে। সুখাদ্য সামগ্রী দর্শনে লালা-নিঃসরণ, অরুচিকর সামগ্রী চিন্তনে, মন ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মত সমর্থিত হয়। অর্থাৎ খাদ্য দর্শনেই তাহার আস্বাদের স্মরণ হয় এবং আস্বাদ নিবন্ধন লালা-নিঃসরণ ও বমনরূপ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা খাদ্য সামগ্রী দর্শনে আস্বাদনের স্মৃতি দেখা যাইতেছে এবং এই দর্শন ও আস্বাদন ক্রিয়ার সংযোগ হেতু, দর্শন দ্বারা আস্বাদানুভূতি স্মৃত হইতেছে। এই স্মৃতি কয়েকটা সাধারণ নিয়ম দ্বারা নিয়মিত।

(১) যে সমস্ত শারীরক্রিয়া, ইন্দ্রিয়জন্যানুভূতি, হর্ষ-বেদনানুভূতি, চিন্তন, মনন প্রভৃতি একত্রে, অবিচ্ছেদে ও ক্রমান্বয়ে সমাহিত হয়, সেগুলির মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় যে, পরে তাহার একটি দ্বারা অপরটির 'স্মরণ' জন্মে বা হয়। ইহাকে "সামীপ্য-রীতি" (Law of Contiguty) বলা যাইতে পারে। এই নিয়ম বা রীতি সমস্ত শারীর ও মানস ক্রিয়াতেই পরিলক্ষিত হয়, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে এই নিয়মের ক্রিয়া দৃঢ়ীকৃত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন। শিশু যখন হাটিতে আরম্ভ করে, তখন দক্ষিণ ও বাম পদের বিক্ষেপ এই নিয়মেই সম্পাদন করে। ডান পা তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাম পা আপনি উঠিয়া পড়ে।

(২) বর্ত্তমান শারীর ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়জন্যানুভূতি, চিন্তন, মনন প্রভৃতির দ্বারা তত্তুল্য ও তৎসদৃশ অতীত শারীর ক্রিয়া প্রভৃতি স্মৃত ও পুনর্জাত হয়। ইহাকে "সাদৃশ্য রীতি" (Law of Similarty) বলা যাইতে পারে। "বৈপরীত্য রীতি" (Law of Contrast or Law of Contrariety) এই সাদৃশ্য রীতির অন্তর্ভূত; প্রতিকৃতি দর্শন করিলে, যাহার প্রতিকৃতি তাহাকে মনে পড়ে; সাদৃশ্যানুভূতি যে স্থলে কম, সে স্থলে এ রীতিতে স্মৃতিরও উদয় সম্ভব নহে।

এই স্থলে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের স্মৃতি, স্মৃতির ন্যূনাতিরেক এবং একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্মৃতির হ্রাস ও বৃদ্ধির আলোচনা করা যাক। এই সাদৃশ্য-রীতি বা নিয়মের কথাই ধরুন। সাদৃশ্য ও পার্থক্য সকলে সমানভাবে অনুভব করেন না। ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতার উপরে এই অনুভূতির তীক্ষ্ণতা বা অল্পতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সারমেয়ের ঘ্রাণ-শক্তি চির-প্রসিদ্ধ; একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তজ্জনিত স্মৃতি দ্বারাই সারমেয় আপনার প্রভুর ও শিকারের গন্তব্য ও গতপথ স্থির করে, এবং ইহার সাহায্যে দস্যু, তস্কর ও নর-ঘাতককে পর্য্যন্ত ধরিয়া ফেলে। কোন কোন মনুষ্যেও এই ঘ্রাণশক্তি অসাধারণরূপে উন্মেষিত। অসভ্য জাতি-সমূহের দূর-দর্শন ও অসাধারণ ঘ্রাণ-শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রবণে-ন্দ্রিয় প্রায় সকলেরই আছে; কিন্তু যাহার সঙ্গীতের শ্রুতি-বোধ বা 'কাণ' (musical ear) নাই, তিনি গায়কের অতি সূক্ষ্ম স্বর-বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারেন না। কোন কোন অসভ্য জাতির

দূর-দর্শন অতীব বিস্ময়কর, বহুদূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যভেদ করে। ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান অবশ্যই ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিবে; যখন বিকলেন্দ্রিয় হওয়া যায়, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান ও নূতন স্মৃতির উৎপত্তিও অসম্ভব হয়।

তারপর স্মৃতি পূর্ব্বসঞ্চিত বা অর্জ্জিত জ্ঞান, ধারণা বা অনুভূতির গভীরতার উপরে নির্ভর করে।

সর্ব্বোপরে আর একটি কথা। সেটি মনোযোগ। এই মনোযোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বা দুর্ব্বলতা এবং পূর্ব্ব-কথিত অনুভূতি প্রভৃতির অগভীরতা বা অস্পষ্টতা দোষ বহু পরিমাণে পরিহার করা যায়। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের অতি নিকট সম্বন্ধ এইখানেই দেখিতে পাইবেন। মনোবিজ্ঞনের সিদ্ধান্তের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনও এই স্থলে বিশেষভাবে দৃষ্ট হইবে,এই স্থলেই ‘ব্যবহারিক-জীবনে’ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ।

স্মৃতি ও মেধা-বৃদ্ধির জন্য কত শিশু ও যুবকের পিতা, মাতা ও অভিভাবক ব্যস্ত, আর আমরাও ত স্বীয় স্বীয় শক্তি-বর্দ্ধনের জন্য কত ব্যগ্র। এই ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতা লক্ষ্য করিয়াই অর্থ-লিপ্সু কত ব্যক্তি স্মৃতি-বর্দ্ধক কত ভেষজের বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছেন; সংবাদপত্রে এরূপ বিজ্ঞাপনের অভাব নাই।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে মেধাকর ঔষধের ব্যবস্থা আছে।

"শঙ্খপুষ্পী বচা সোমা ব্রাহ্মী ব্রহ্ম সুবর্চ্চলা
অভয়া চ গুড়ূচী অটরূষকবাকুচী
এতৈরক্ষ সমৈর্ভাগৈর্ঘৃতং প্রস্থং বিপাচয়েৎ
কণ্ঠকার্য্যা রসং প্রস্থং বৃহত্যাচ সমন্বিতম্।
এতদ্ব্রাহ্মীঘৃতং নাম স্মৃতি-মেধাকরং পরম্।"

(গরুড় পুরাণ, ১৯৮ অধ্যায়।)

(স্মৃতি-বর্দ্ধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।)

যাহা সেবন করিলে, সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নীত হয় এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সতেজ হয়, তাহা যে—সাক্ষাৎভাবে না হৌক্ পরোক্ষভাবে—স্মৃতিবর্দ্ধক, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু, স্মৃতি-বর্দ্ধনের উপায়সমূহ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। শিক্ষনীয় বিষয় যাহাতে বিশেষ ভাবে শিক্ষার্থীর মনে মুদ্রিত হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। এই জন্য ইন্দ্রিয় সমূহের শিক্ষাই প্রথম শিক্ষা; আধুনিক "কিণ্ডারগার্ডেনে"র শিক্ষা-প্রণালীও এই শিক্ষা বৈ আর কিছুই নহে। শিশুদিগকে বিশেষ ভাবে দ্রব্য বা বস্তু সমূহের রূপ, রস, গন্ধ, আস্বাদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই মূল ভিত্তির উপরে যৌবনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত।

তার পরে ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্ব্বলতা ও তজ্জনিত ত্রুটি অনেক পরিমাণে মনঃসংযোগের দ্বারা পূরণ করা যায়। অভিনিবেশ

ব্যতিরেকে স্মৃতির উন্মেষ ও জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব। শিক্ষক বহুবিধ উপায়ে শিক্ষিতব্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শিক্ষকের কৌশল ও উপযুক্ততা এই মনোযোগ-আকর্ষিণী শক্তির উপরে নির্ভর করে। অধ্যাপক যদি অধ্যাপনার বিষয়টিকে মনোমদ ভাবে ছাত্রদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে না পারেন তবে তাঁহার আয়াস ও অধ্যাপনা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। অনেকে বলিবেন—যাহার স্বভাবতঃ মেধা কম তাহার মেধা বৃদ্ধি করা যায় না—সাধারণ কথায় বলে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না। সে কথা সত্য; অর্থাৎ, স্মৃতি যদি যথার্থই জৈবিক (Biological) হয় তবে বাহ্যিক চেষ্টা ও আয়াসে তাহার যৎসামান্য উন্নতিই সম্ভব; বংশানুক্রমের ফল, শরীরের অবস্থা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই এড়াইতে পারা যায় না; গাধা ঘোড়া না হইতে পারে, কিন্তু গাধাকে কিয়ংপরিমাণে বুদ্ধিমান্ গাধা বা কোন না কোন বিষয়ে ঘোড়ারও গুণোপেত করা যাইতে পারে।

এ স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন যে, সাধারণভাবে স্মৃতি বা মেধার উন্নতি করা সম্ভবপর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্মৃতি মনের একটা অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, বা বিশেষ শক্তি নয়। স্মৃতি বহুরূপা। সুতরাং কোন বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ দ্বারা সেই বিষয়কে বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক করিয়া, সেই বিষয়ের স্মৃতিকে বর্দ্ধিত ও উন্নীত করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে স্মৃতির প্রাখর্য্য-বর্দ্ধন অসম্ভব। কারণ, তাহা দৈহিক স্বাস্থ্য, পিতৃপিতামহাগত শক্তি ও সংস্কারের উপর

নির্ভর করে। অনেক সময়ে মনের বিচারশক্তি, (Reason) কল্পনা (Imagination) প্রভৃতির সমূহ ক্ষতি করিয়া মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধন করা অসম্ভব নহে; কিন্তু, তাহা কতদূর বাঞ্ছনীয়, আপনারা অনুমান করিতে পারেন।

পাঁচ বিষয়ের কথা, পাঁচ রকম আবৃত্তি চলিতেছে,—একবার শুনিয়াই শ্রুতিধর তাহার পুনরুল্লেখ বা আবৃত্তি করিতে পারে; অথচ দেখিবেন যে, এই শ্রেণীর লোকের বুদ্ধির প্রখরতা বিশেষ কিছুই নাই, এবং তাহারা অন্য কোন বিশেষ মানসিক শক্তি-মণ্ডিতও নয়; পরন্তু ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, শব্দ বা অন্য স্মৃতির বিশেষ বিকাশ-নিবন্ধনই অপরাপর মানসিক শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে, এবং সাধ্য ও শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। বিনা অর্থবোধে শব্দমালা কণ্ঠস্থ করা (ইংরাজিতে যাহাকে Cramming বলি) হেয় বলিয়াই সকলে মনে করেন; এই হীনতার প্রধান কারণ এই যে, মস্তিষ্কের অযথা উত্তেজনা ঘটে এবং তাহাতে মনের অপরাপর ক্ষমতার অপচয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত দুইটি নিয়ম ভিন্ন আর একটি নিয়মও স্মৃতিতে প্রযুক্ত—(৩) শারীর-ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়জন্যানুভূতি, চিন্তন এবং ভাব-গুলি একাধিক বর্ত্তমান বস্তু ও অনুভূতির সহিত সাদৃশ্য বা সামীপ্য রীতিতে সংযুক্ত হইলে তাহা সহজে স্মরণ-পথে বা স্মৃতিতে উদিত হয়। ইহাকে "মিশ্র-সমবায়-রীতি" (Compound association) বলা যাইতে পারে। স্মৃতির স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মত্রয়ের ক্রিয়া দেখিতে পাইবেন। আবার অপর

দিকে স্মৃতি-বিভ্রম বা স্মৃতির অস্বাভাবিক বা অসাধারণ বিকাশের বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা স্মৃতির প্রকৃতি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিব।

স্মৃতি-বিভ্রম

স্মৃতির পীড়া বা অস্বাভাবিক অবস্থা

বিকৃতি দ্বারা প্রকৃতি নির্দ্দিষ্টা হয়। কথাটা একটু কেমন কেমন বোধ হইলেও বড়ই ঠিক। স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা লক্ষীভূত হয় না, অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা পরিস্ফুট হয়। শরীর-তত্ত্ব বিশেষভাবে জানিবার উপায়ই—ব্যাধির লক্ষণানুসন্ধান। তাই শরীর-বিজ্ঞান, অস্থি-বিদ্যা (Physiology, Anatomy, Osteology) প্রভৃতি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থীর পঠনীয়। স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি-ভ্রংশ, স্মৃতির পীড়া ইত্যাদির পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাও আমরা তাহার প্রকৃতি জানিতে পাই। প্রথমে স্বাভাবিক স্মৃতি-ভ্রংশের কথাই ধরুন।—বার্দ্ধক্যে স্মৃতি-বিভ্রম সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই স্মৃতি-ভ্রংশের একটা সুনিশ্চিত ক্রম আছে। স্বাভাবিক ও সুস্থাবস্থায় আমরা কি দেখিতে পাই? যে সকল ঘটনা অল্পদিন হইল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বেশ মনে থাকে। কাল যাহা ঘটিয়াছে, তাহার স্মৃতি দশ দিন পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বল, অদ্যকার ঘটনার স্মৃতি কল্যকার ঘটনার স্মৃতি অপেক্ষা স্পষ্টতঃ, আবার কল্যকার ঘটনার স্মৃতি তৎপূর্ব্ব দিনের ঘটনার

স্মৃতি অপেক্ষা দীপ্ততর ;—এই প্রকার যতই অতীতের দিকে অগ্রসর হইবেন, স্মৃতির তেজহীনতা ততই লক্ষ্য করিবেন। ইহাই স্বাভাবিক বা সাধারণ ক্রম বা নিয়ম। কিন্তু বার্দ্ধক্যে ইহার বিপরীত ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধেরা আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভুলিয়া যান। কিন্তু কল্যকার কথা তাহাদের বেশ মনে থাকে প্রৌঢ়াবস্থার কথা স্মরণ নাই, কিন্তু বাল্য বা যৌবনের কথা বেশ মনে থাকে। অনেক অতিবৃদ্ধ স্বীয় পৌত্র বা প্রপৌত্রকে চিনিতে বা তাহাদের নাম স্মরণ করিতে অক্ষম ; কিন্তু বাল্য-বন্ধু ও বাল্য-সহচরের নাম বা তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের কাহিনী বেশ বলিতে পারেন। এক নবতিপর বৃদ্ধার কথা মনে হয়। তিনি ঐ বয়সে ঘাটে আসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন—দৃষ্টিহীনতা বিশেষ কিছু ছিল না। তাঁহার নিকটে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতাম, সকল সময়েই আমার নাম তাঁহার নিকটে উচ্চারিত হইত তথাপি দেখা হইলেই বলিতেন—'তুই কে'? নাম বলিলেও চিনিতেন না, পিতার নাম বলিলেও মনে পড়িত না ; কিন্তু পিতামহের নাম বলিলে তাঁহার মুখমণ্ডলে এক আশ্চর্য্য আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিত, এবং পিতামহের বাল্যকালের কত কথাই বলিয়া ফেলিতেন,—যেন সেই সুদূর অতীতের ঘটনাবলী বায়স্কোপের দৃশ্যাবলীর ন্যায় তাহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিত। আমার বোধ হয় সকলেই এই প্রকার দু'একটা বৃদ্ধের বিষয় অবগত আছেন। 'নিকট' অতীত অপেক্ষা 'সুদূর' অতীতের স্মৃতি সহজ। নূতন বিনষ্ট হয়, পুরাতন থাকিয়া যায়—কথাটা শুনিতে

হেঁয়ালীর ন্যায় বোধ হয় ; কিন্তু, সত্য। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই মনে হয় যে, স্বভাবতঃ বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন এবং কথন কথন পীড়ার দরুণ শরীরস্থ কোষগুলির জীবনী-শক্তি বিশেষভাবে নূতন 'ছাপ' গ্রহণ করিবার ও নূতন সমবায় সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু বাল্যে, যৌবনে বা সুস্থাবস্থায় যে সমস্ত 'ছাপ' গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা সহজে বিলুপ্ত হয় না।

স্মৃতি দেহকে ছাড়িয়া অবস্থান করিতে পারে না;- ইহা দেহাবস্থিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। স্নায়ু ও মস্তিষ্ক পুষ্ট না হইয়া নষ্ট হইতে আরম্ভ করিলে স্মৃতিও নষ্ট হয়। পোষণ-ক্রিয়ার অর্থই নব নব বাহ্য (আহারাদি দ্বারা গৃহীত) বস্তুকে অঙ্গীভূত করা, এবং এমনি ভাবে স্মৃতিও নব নব অনুভূতি প্রভৃতিকে অঙ্গীভূত করে। মানসিক স্মৃতি বাস্তবিকই এই জৈবিক স্মৃতির রূপান্তর।

স্মৃতি-ভ্রংশের বা পীড়ার বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা এই ক'একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই। স্বভাবতঃ স্মৃতি-ভ্রংশের ইহাই ক্রম।

(১) প্রথমে অল্পদিনের ঘটনার বিস্মৃতি। তৎপরে সাধারণ ভাব-বিস্মৃতি। ক্রমে সুখ-দুঃখানুভূতির বিস্মৃতি ; এবং সর্ব্বশেষে শারীর-ক্রিয়ারও বিস্মৃতি—বৃদ্ধেরা আহারাদির অব্যবহিত পরেই আহারের কথা ভুলিয়া যান।

(২) ভাষা বা শব্দ-বিস্মৃতিতে নিম্নোক্ত পর্য্যায়ও পরিলক্ষিত হয়।—প্রথমে বিশেষ নাম পরে সাধারণ নাম (বিশেষ্য), পরে বিশেষণ (গুণবাচক শব্দ) তৎপরে ক্রিয়াবাচক শব্দ, এবং সর্ব্বশেষে অঙ্গ-ভঙ্গী ইত্যাদি। (Gesticulations) ব্যক্তি-বিশেষের নাম—হরি, রাম প্রভৃতি স্মরণ হইবে না; কিন্তু সে যে যুবা পুরুষ তাহা মনে থাকে। জাতিবাচক নাম—গো, অশ্ব মনে থাকে না; তৎপরিবর্ত্তে বলা হয়—ঐ যে খুব ছুটে যায়, যেটা ঘাস খায়, ইত্যাদি।

(৩) ভ্রমের গতি নূতন হইতে পুরাতনে, জটিল হইতে সরলে, মিশ্র হইতে অমিশ্রে।

(৪) পীড়া শান্তি হইলে আবার ঠিক বিপরীত ভাবে স্মৃতির উদয় হয়। অর্থাৎ যাহা পরে পরে ভুলিয়াছি তাহাই ক্রমশঃ স্মৃতিতে উদয় হয়।

এ সম্বন্ধে ডাক্তার মড্‌স্‌লি, কার্পেণ্টার, রিজে প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে প্রভূত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

কাহারও কাহারও মতে—যাহা একবার জ্ঞাত, অনুভূত বা যৎসম্বন্ধে একবার কোন মনন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, তাহা কস্মিন্ কালেও বিলুপ্ত হয় না,—স্মৃতি-পথে উদিত না হইলেই যে তাহা সর্ব্বথা বিলুপ্ত হইল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই; পরন্তু অনেক বিষয়, যাহা বহুবর্ষ পূর্ব্বে বা শৈশবে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ বা আকস্মিক কোন উত্তেজনা বশতঃ সহসা স্মৃতি-মুকুরে প্রতিভাত হয়। মনোবিজ্ঞান-গ্রন্থে এই প্রকার স্মৃতির দৃষ্টান্ত

উল্লিখিত হইয়াছে।—কোন য়ুরোপীয় রমণী জল-মগ্ন হইয়া জীবন ও মরণের সন্ধি-স্থলে উপনীতা হইয়াছিলেন। বহু কষ্টে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়; সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি তাঁহার সেই ভীষণ সময়ের মানসিক অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিয়াছেন যে, তৎকালে যেন জীবন-গ্রন্থের প্রতি অক্ষর ও ঘটনা অতি সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে তিনি যাহা অনুভব, চিন্তা বা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা সমস্তই পরিষ্কার তাহার মনে পড়িয়াছিল ; পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, যাহা এত অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর যে, কথনও আর স্মৃতিতে জাগরূক হয় নাই তাহাও চিত্ত-ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিল। আবার আর এক ব্যক্তি রেলওয়ে রাস্তার উপরে অতর্কিতভাবে কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ একটা এক্সপ্রেস ট্রেণ প্রচণ্ডবেগে মূর্ত্তিমান কালের ন্যায় সেই পথে আসিয়া পড়ে। তথন মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই রাস্তার মধ্যে শুইয়া পড়িয়া তাঁহাকে জীবন-রক্ষা করিতে হয়। তিনি তাঁহার তাৎকালিক স্মৃতির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য। সেই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে যেন তাঁহার জীবন-নাট্যের প্রত্যেক অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল। তিনি বলেন যে, শৈশব, বাল্য ও যৌবনের এমন সকল ঘটনাপুঞ্জ তাঁহার স্মৃতিপট দিয়া বায়স্কোপের দৃশ্যাবলীর ন্যায় উদয় হইয়া গেল, যাহা আর জীবনে কথনও তিনি স্মরণ করিতে পারেন নাই। পীড়ার সময়েও যে এই প্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনাবশতঃ অনেক বিশেষ স্মৃতি

জাগরূক হয় তাহা সকলেই জানেন। ভীষণ জ্বরের প্রকোপে মস্তিষ্কের শোণিত প্রবাহের আধিক্য ও প্রবলতা প্রযুক্ত রোগী যে সকল প্রলাপোক্তি করে তাহা অসম্বন্ধ হইলেও, অনেক সময়েই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সমস্ত উক্তি পরিত্যক্ত, বিস্মৃত ও লুপ্ত জ্ঞানের পুনরুন্মেষ মাত্র। উন্মাদাগারের উন্মাদদিগের বিবরণী পাঠ করিলেও মনোজগতের অনেক অতীব বিস্ময়কর ও অদ্ভুত তথ্য সমূহ জানা যায়। অনেক উন্মাদ, জীবনের কোন অংশের সকল কথাই ভুলিয়া যায়, এবং কোন কোন অংশের সামান্য সামান্য ঘটনাও স্মরণ করিতে পারে।

সম্মোহন-নিদ্রা (Hypnotic sleep) দ্বারা যাহারা অভিভূত তাহাদের স্মৃতির বিবরণ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। তাহাদের যেন দু'টি মন ও দু'টি স্মৃতি; কখনও একটা জাগ্রত, অপরটা সুপ্ত। এবংবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহারা বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অনুভূত কোন বিষয়ই একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তাহাদের মতই সমর্থিত হয়।

সে যাহা হউক, বিশেষ উত্তেজনাক্রমে বা বিশেষ কারণ বশতঃ আপাতদৃষ্টিতে যাহা বিলুপ্ত বলিয়া মনে করি তাহাও যে স্মৃত হয়, এ প্রকার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে এরূপ দৃষ্টান্তও দিয়াছেন যে, কোন স্থানে উপস্থিত হইলেই তাহা যেন কখনও দেখিয়াছি, তাহা যেন পূর্ব্বপরিচিত, এইরূপ মনে হয়। ইহাকে কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিও বলেন। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের আলোচনা বিজ্ঞানের সীমার বাহিরে। তবে ইহা বলা

যাইতে পারে, পূর্ব্ব-দৃষ্ট স্থানের সাদৃশ্য বা বিস্মৃত দৃশ্যের পুনরুন্মেষেও এই প্রকার ঘটিতে পারে। অতি শৈশবে যে স্থান দেখিয়াছি, যাহার স্মৃতি কখনও মনে উদিত হয় নাই হঠাৎ তাহা দেখিয়া পূর্ব্ব দৃষ্ট স্থান বলিয়া মনে হয়। শিশু ভূমিষ্ট হইয়াই ইন্দ্রিয়-মার্গে নানা প্রকার জ্ঞানার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, এবং সেই শৈশবের জ্ঞান-ভিত্তির উপরেই পূর্ণ বয়সের বিপুল জ্ঞানসৌধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শৈশবের কয়টি স্মৃতি শেষজীবনে জাগাইয়া তুলিতে পারেন ? যেমন অট্টালিকার ভিত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত থাকে এবং মৃত্তিকা খনন না করিলে সে ভিত্তি দৃষ্টি-গোচর হয় না, শৈশবার্জ্জিত জ্ঞানরাশিও তেমনি সহজে মনে পড়ে না—অথচ শৈশবে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় তাহার এক সামান্য অংশও যৌবনে প্রৌঢ়ে বা বার্দ্ধক্যে অর্জ্জিত হয় না। তবে কোন কোন বিশেষ ঘটনা মনে থাকে বটে। এস্থলে আমার জীবনের একটি ব্যক্তিগত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।—আমার বয়স যখন তিন কি সাড়ে তিন বৎসর, তখন আমার স্বর্গীয় জনক, জননীর সহিত 'পিরোজপুরে' ছিলাম। তখন সেখানে একটা প্রচণ্ড ঝড় হয় এবং বালেশ্বর নদীর জল স্ফীত হইয়া সেই উপনগরটিকে সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত করিয়া ফেলে। সেই জলপ্লাবন আর অর্দ্ধঘণ্টাকাল স্থায়ী হইলে বোধ হয় সে স্থানটি একেবারে জনশূন্য হইত। সেই সময়ের ঘটনা সমূহ যেন অদ্যাপি আমার চোখের সাম্নে ভাসিতেছে। অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ১২'টা ১'টা পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্যেক অংশ আনু-পূর্ব্বিক আমার মনে আছে। আমার স্মৃতির শুদ্ধতা পরীক্ষা

করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছিলাম। পিরোজপুরের উকিল বাবু সতীশচন্দ্র সেনের পিতা অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মোক্তার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেই ঝড়ের দিনে আমাদের সহিত এক বাড়ীতেই ছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই স্মরণীয় দিনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই আমার স্মৃত ঘটনার সহিত আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গেল। অথচ সেই সময়ের, তৎপূর্ব্বের ও তৎপরেরও অনেক ঘটনা বিস্মৃতির অতল-গর্ভে ডুবিয়াছে—বহু চেষ্টাতেও তাহা মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারি নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—সমসাময়িক ঘটনা একই ভাবে স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকে না। ইহার বিশেষত্ব, গুরুত্ব, অভিনবত্ব ইত্যাদির উপরে এই মুদ্রণকার্য্যের ক্ষণস্থায়িত্ব বা স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন—বহু চেষ্টা ও আয়াস দ্বারাও অনেক সময়ে কোন একটি বিষয়, নাম বা শব্দ স্মৃতিতে উদিত করা যায় না, কিন্তু যখন মন অন্য বিষয়ে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট, তখন হঠাৎ সেই বিস্মৃত বিষয়, নাম বা শব্দ মনে পড়িয়া যায়। আমাদের চৈতন্যের অগোচরেও যে মানসিক অন্বেষণের কার্য্য চলিতেছিল, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইহাকে চেতনার বাহিরের (বহিশ্চৈতন্যমনন) মস্তিষ্ক-ক্রিয়া (Unconscious cerebration) বলিয়া থাকেন। বহু চেষ্টায় ও আয়াসে যাহা স্মরণ করা গেল না তাহা বিনা চেষ্টা ও

যত্নে কি প্রকারে স্মৃত হইল, পণ্ডিতেরা ইহা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্যর্থ-প্রয়াসের কথাই ধরা যাক্।—যে সাদৃশ্য, সামীপ্য, ও মিশ্র সমবায়-রীতির সাহায্যে বাঞ্ছিত বিষয় বা নাম স্মৃত হইতে পারে, ঠিক সে রীতি অবলম্বিত হয় নাই, বরং স্মরণ করিবার ব্যগ্রতা প্রযুক্ত ভ্রান্ত রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে; অথবা স্নায়ু ও মস্তিষ্কের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যে মস্তিষ্ক বা স্নায়ু-পথে, ইচ্ছা, বিচরণ করিলে অন্বেষ্টব্য বিষয় বা নামটি স্মৃত হইত, ইচ্ছা-শক্তি সে পথে বিচরণ করে নাই, বরং হয়ত ঠিক বিপরীত পথে বেগে পরিভ্রমণ করিয়াছে। পরে যখন সে বিষয়ের সন্ধান পরিত্যাগ করায় সেই ইচ্ছা শক্তি স্থগিত হইল বা মনের শান্ত ও সমাহিত ভাব উপস্থিত হইল, তখন চৈতন্যের অগোচরে যে সামান্য শক্তি ক্রিয়া করিতেছিল তাহাই উপযুক্ত পথে পরিচালিত হওয়ায় অভীপ্সিত স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইল। স্মৃতি-শক্তির উপযুক্ত শিক্ষা সেখানেই, যেখানে এই অন্বেষণ-ক্রিয়া অথবা ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া ঠিক পথে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এক গ্রন্থে স্মৃতি সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে। সুরাসক্ত এক ব্যক্তি সুরোন্মত্তাবস্থায় তাঁহার একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ হারাইয়া ফেলেন। যখন নেশা ছুটিয়া গেল, সেই প্রয়োজনীয় জিনিষটির জন্য বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু, কিছুতেই তাহা মিলিল না। ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং কিছু দিনের জন্য সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু জিনিষটার কিছুতেই উদ্ধার হইল না। যে প্রকার প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া

থাকে—সেই সুরাপায়ীর সুরা-পরিত্যাগ-সঙ্কল্প কাল-প্রবাহে আবার শিথিল হইয়া পড়িল। একমাস পরে আবার সে ব্যক্তি যখন পূর্ব্ববৎ সুরোন্মত্ত হইল তখন সেই অবস্থাতেই যে স্থানে সেই দ্রব্যটি হারাইয়া গিয়াছিল ঠিক সেই স্থানেই তাহা পাইলেন। ইহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, মনের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুল্যতা বা সমত্ব অথবা অনুকূল অবস্থা না আনয়ন করিতে পারিলে, স্মৃতির উদ্ভব সম্ভবপর নহে।

কোন বড় একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হঠাৎ তাহার চাবিটা খুঁজিয়া পান না। সেই ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকার কারবার হয়, এবং বহুলোকের বিপুল ধনরাশি সেখানে গচ্ছিত থাকে। চাবিটা হারাইয়া ম্যানেজার মনে করিলেন যে ব্যাঙ্কেরই কোন কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক চাবিটি অপহৃত হইয়াছে। নানাপ্রকারে অনুসন্ধান করিলেন, কোনও কর্ম্মচারীই চাবি সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেন না। ঐ চাবির সাহায্যে ব্যাঙ্কে চুরি না হয়, তজ্জন্য বিবিধ পুলিশ-প্রহরী নিযুক্ত হইল, এবং পুলিশেরা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে সেই ম্যানেজার বহু অর্থ-ব্যয়ে একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌-টিভের শরণাপন্ন হইলেন। সেই ডিটেকটিভ কয়েক দিন অন্বেষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, চাবিটা নিশ্চয়ই কেহ চুরি করে নাই, ম্যানেজারই কোথাও রাখিয়াছেন। একদিন সে গুপ্ত সন্ধানকারী ব্যক্তি ম্যানেজারকে বলিলেন—"মহাশয়, আপনার কোন ভাবনা নাই, চাবি চুরি হয় নাই আপনিই কোন স্থানে রাখিয়াছেন। ব্যগ্রতায় ও মনের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় এখন কিছুতেই স্মরণ

হইতেছে না। চাবি অন্ত হইতে চারিদিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে, ইহা স্থির জানিয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হউন, এবং এই বহু ব্যয়-সাধ্য পুলীশ-প্রহরীর বন্দোবস্ত তুলিয়া দিন। এই চারিদিন চাবির বিষয় একেবারেই ভাবিবেন না।" ডিটেক্‌টিভের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ম্যানেজার তদ্রূপ আচরণ আরম্ভ করিলেন এবং ঠিক চতুর্থ দিবসে তাহার মনে পড়িয়া গেল—তিনি নিজেই চাবিটি আপন গৃহ-কোণে একটা সামান্য ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য ঠিক সেইখানেই চাবিটা পাওয়া গেল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে?—মনের অস্বাভাবিক অবস্থা পরিহার এবং তজ্জন্য বিপরীত পথে বিচরণ পরিত্যাগ করিয়া মনের সাম্যাবস্থা না আনিলে স্বভাবতঃ ঠিক স্মৃতির উন্মেষ হয় না। এই স্থানেই এই প্রবন্ধেই পূর্ব্বোক্ত হেঁয়ালীর কথাটা মনে হয়—বিস্মৃতিই স্মৃতির উপায়। কতকগুলি প্রতিকূল বিষয়কে বিস্মৃতিতে ডুবাইতে না পারিলে ঈপ্সিত বিষয়ের স্মৃতি সম্ভবে না। যেমন আবর্জ্জনা দূর করিতে না পারিলে অনেক সময়ে তদাচ্ছাদিত অন্বেষ্টব্য পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এক্ষেত্রেও তাই। শৃঙ্খলার (order'এর) আবশ্যকতাও এইস্থলে। যেমন কোন স্থানে অনেকগুলি জিনিষ বিশৃঙ্খলভাবে রাখিয়া দিলে কোন একটি জিনিষ তথায় হাত দিলেই পাওয়া যায় না বহু আয়াস ও অন্বেষণ আবশ্যক, স্মৃতি সম্বন্ধেও তাই। শ্রেণীবিভাগ, শৃঙ্খলা প্রয়োজনের ন্যূনাতিরেক অনুসারে দ্রব্যসম্ভারের সংস্থাপন ও নামকরণ ইত্যাদিদ্বারা স্মৃতির সাহায্য ঘটে।

নাম অথবা শব্দসাদৃশ্য দ্বারা স্মৃতির উন্মেষের বিষয়ই অনেকেই জানেন এবং স্মৃতির সহায়তার জন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Mnemonic বলে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ ছন্দে বিরচিত হইত। ভূগোল, খগোল, জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র পর্য্যন্ত শ্লোকে নিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। এই পদ্ধতি যে কেবল গ্রন্থ-রচয়িতার শব্দ ও ভাব-সম্পৎ, অলঙ্কারের জ্ঞান কবিতা-রচনার কৌশল ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে। ইহাদ্বারা শিক্ষার্থীর স্মৃতিরও সাহায্য হইত। বাল্যকালে ইতিহাস পাঠে মোগল সম্রাটদিগের নামাবলী ছন্দে আমরাও শিক্ষা করিয়াছি বা মুখস্থ করিয়াছি। এখনও ইংরাজী মাসের কোন কোন মাসে কয়দিন স্মরণ করিতে হইলে "Thirty days hath September" "ত্রিশ দিবসে হয় মাস সেপ্টেম্বর" ইত্যাদি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া থাকি। লিখন-প্রণালী মুদ্রণ প্রণালী ইত্যাদি আবিষ্কারের পূর্ব্বে স্মৃতিই জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায় ছিল। আমরা এক্ষণে লিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র বেদকে স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া স্মৃতি-নামধারী,—"স্মরন্তি বেদমনয়া স্মৃতিঃ।" অল্প কথায় বহুভাব দ্যোতনা করে—স্মৃতির সাহায্য হয় বলিয়া সূত্রের প্রবর্ত্তনা।

স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনাবাদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ॥

তবে এই পদ্ধতিকে এখন আর কেহ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন না, বরং হেয় বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন।

স্মৃতিশক্তিকে অক্ষুন্ন ও অপরাজেয় করিতে হইলে স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করিতে হয়। যে কোষবহুল মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপদার্থকে স্মৃতির অতি আবশ্যকীয় ও প্রধান যন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথম সেই মস্তিষ্ক ও স্নায়ু পদার্থের বন্ধন ও দৃঢ়ীকরণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ পরিপাচনে অভিনিবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। তার পরে যে সকল নিয়মে ও ধারায় স্মৃতির উন্মেষ হয় তৎসমুদয় নিয়মের অনুবর্ত্তন; সর্ব্বোপরি অভিনিবেশ। এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই স্মৃতি প্রখরা হয়। সমগ্র শিক্ষা ও শাস্ত্রের মূল্য এইখানে। শিক্ষার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিন। দৈনন্দিন জীবনের কথাই ভাবুন। জীবনটা মধুময় করিতে হইলে স্মৃতি যাহাতে মধুময় হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। সেই বিষয়েই অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে যাহার স্মৃতি অশান্তি ও উদ্বেগ আনয়ন না করে। স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনের কথা সকলেই শুনিয়াছেন, এবং অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। সেই বৃশ্চিক অনেকটা আমাদের সৃষ্টি। যদি দেহ, মন ও হৃদয়ের অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানে আমাদের চিত্তক্ষেত্র সতত সমাচ্ছন্ন থাকে, তবে আর স্মৃতির বৃশ্চিক-জ্বালা জুড়াইবার উপায় কি? সেই সংস্কার-জাল ছিন্ন করিবার ক্ষমতা কোথায় পাইব? স্বাস্থ্যকর, আনন্দদায়ক বিষয়ে নিত্য নিবিষ্ট থাকিলেই আমাদের স্মৃতিভাণ্ডার আনন্দ ও অমৃতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। অসাড়,

অসম্বদ্ধ, পীড়াদায়ক সংস্কার-নির্ম্মুক্ত হইতে হইবে। কারণ, যে কুসংস্কার-গ্রন্থিসমূহ হৃদয়কে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে ছিন্ন করিতে পারিলেই স্মৃতি সুধাময় হয়, এবং আনন্দঘনের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

স্বপ্ন-তত্ত্ব

"অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়,
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে ফাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা।"

স্বপ্ন-প্রয়াণ (দ্বিজেন্দ্রনাথ)।

আমরা সকলেই 'স্বপ্ন দেখি'। আদিম মানব হইতে, বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানাভিমানী সুসভ্য মানব সকলেই 'স্বপ্ন দেখিয়া' আসিতেছে, এবং এই স্বপ্ন-রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে এবং পাইতেছে, কিন্তু, এই নিত্য ও সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ ব্যাপারটির উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আজও যে বিশেষ কোন অবিসম্বাদী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। অথচ বিষয়টী এতই মনোমদ ও চিত্তাকর্ষক যে, ইহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা না পাইয়াও মানব-চিত্ত সর্ব্বদাই ইহার নানা প্রকারের অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যানে নিবিষ্ট ও উন্মুখ।

নিত্য-প্রত্যক্ষ ও সর্ব্বদা অনুভূত ব্যাপারগুলিই চির-রহস্যাবৃত। শুধু যে কবির ভাষায়ই বলিতে হয় যে আমরা 'অসীম রহস্য মাঝে' ডুবিয়া আছি, তাহা নয়; জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে এই রহস্যের বিশালতা, দুরবগাহত্ব ও অসীমতা আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি, কিন্তু যে রহস্য সেই রহস্যই রহিয়া যাইতেছে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে এই জাগতিক ব্যাপারগুলি যাহা এক দিক্ দিয়া রহস্যময় ছিল, তাহা অপর দিক্ দিয়া নিবিড়তর রহস্যাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

আদিম মানবের নিকট, এই চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডল, এই সোদামিনী-লাঞ্ছিতা জলদমালা, ঐ তরঙ্গভঙ্গ-রঙ্গময়ী স্রোতস্বিনী, ঐ তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ গিরিশিখর, একভাবে রহস্যময় প্রতীত হইত, আর বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহাই অন্যভাবে গভীরতর রহস্যাবৃত বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

আমাদের বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বপ্নরহস্য জিজ্ঞাসারও উদয় হইয়াছে; কিন্তু স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ের 'স্বপ্ন কেবল কতকগুলি অলীক চিন্তামাত্র' এই শিক্ষায় সে রহস্য-জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয় নাই। কত সহস্র বৎসর মানব যে এই স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যানে নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

বর্ত্তমান যুগে, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান ও তদন্তর্গত স্নায়ু-বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেই স্বপ্নোৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আরম্ভ। তৎপূর্ব্বে অবৈজ্ঞানিক ও অতি-প্রাকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা এই তত্ত্বটি একেবারে গভীর কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

আদিমানব (Primitive man) কি অসভ্য জাতি-সমূহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দু, মিশরীয়, বেবিলোনিয়, এসাইরিও গ্রীক, য়িহুদী, খৃষ্টীয় প্রভৃতি প্রাচীন কালের সুসভ্য জাতি-সমূহের মধ্যেও 'স্বপ্ন' সম্বন্ধে নানাপ্রকারের অতিপ্রাকৃত ও অতিমানুষ ব্যাখ্যাই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ইতিহাস আলোচনা দ্বারাই মানব-সভ্যতার নানা স্তর ও ক্রমের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইতে পারে ।

আমাদের পুরাণাদিতে 'সুস্বপ্ন' ও 'দুঃস্বপ্নে'র নানাপ্রকারের ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যান-প্রণালী দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা স্বপ্নের শুভাশুভ বিচার করিতেন, তাঁহারা 'স্বপ্নবিচারী' আখ্যাপ্রাপ্ত হইতেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যান-প্রণালীর কথা এই ভাবে লিখিত আছে ঃ—

"কেন স্বপ্নেন কিং পুণ্যং কেন পুংসাং তাবৎসুখম্।
কোঽপি কোঽপি চ সুস্বপ্নস্তৎ সর্ব্বং কথয় প্রভো ॥"

ভগবান উবাচ।—

বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
তত্রৈব কাণ্ব শাখায়াং পুণ্যকাণ্ডে মনোহরে ॥
সুব্যক্তো যশ্চ সুস্বপ্নঃ শশ্বৎ পুণ্যফলপ্রদঃ।
তৎসর্ব্বং লিখিতং তাত কথয়ামি নিশাময় ॥

ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতি-সমূহের মধ্যে একদল ‘স্বপ্ন বিচারী’ লোক (Soothsayers and divines) ছিলেন, কালক্রমে তাঁহারাই পৌরহিত্যে ও যাজকত্বে ব্রতী হইয়াছিলেন।

টাইলর, স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষীগণের মতে আদিম মানবের (Primitive man) পরলোকে বিশ্বাস ও দেহাতিরিক্ত ‘আত্মার’ জ্ঞান, এই স্বপ্নসম্ভূত বটে; অর্থাৎ আদিম মানব ও প্রাকৃত জনেরা স্বপ্নাবস্থায়, নানাস্থানে বিচরণ, নানা দৃশ্য দর্শন প্রভৃতি দ্বারা, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব এবং তাহার দ্বিত্ব বা দ্বৈতভাব উপলব্ধি করে। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির সন্দর্শন ও তৎসহ আলাপন ইত্যাদি দ্বারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হয়। পরবর্ত্তী যুগসমূহেও, ‘স্বপ্নাবিষ্ট’ ব্যক্তি ‘আবিষ্ট’ অর্থাৎ অন্যদ্বারা অভিভূত এবং সেই অন্যই অতি-মানুষ জীব, যথা—ভূত, প্রেত ও দেবযোনি-সমূহ; তাঁহারাই, নিদ্রাবস্থায়,—মানব যখন নিঃসহায়, সংজ্ঞা ও চৈতন্য-বিরহিত থাকে, তখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। জাগ্রতাবস্থায় মানবাত্মার সহিত, দেহ- বর্জ্জিত অশরীরী জীব-সমূহের সংশ্রব ও সংস্পর্শ সম্ভব হয় না।

মৃত্যুকল্পা নিদ্রার সময়ে যখন মানবদেহ ও মন নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় থাকে, তখনই অশরীরী আত্মা-সমূহ মানবদেহে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া, তাহাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করে; ঐ বক্তব্য ও মন্তব্য দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই ‘স্বপ্নবিচারী’ জ্ঞানী (!!) গণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

স্বপ্নসম্বন্ধে মানবের যুগযুগ-ব্যাপী বিশ্বাস ও ধারণার আলোচনা অতীব মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঠিক্ তাহা নয়; বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা স্বপ্নের উৎপত্তির ও প্রকৃতির কথঞ্চিৎ আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য।

আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার পূর্ব্বে, তৎসদৃশধর্ম্মাবলম্বী কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা আবশ্যক।

ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে 'সম্মোহিনী' বিদ্যাদ্বারা ও কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে 'মুগ্ধ' বা 'অভিভূত' করা যায়। ইংরেজীতে এই সমস্ত প্রক্রিয়া Hypnotism mesmerism, electro-biology প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা 'মুগ্ধ' ব্যক্তি-গণের এক প্রকার নিদ্রার উদ্ভব হয় এবং স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে। তবে সেই স্বপ্ন ও স্বভাবতঃ যে স্বপ্নদর্শন ঘটে, তাহাতে ঢের পার্থক্য আছে। 'মুগ্ধ' ব্যক্তিকে প্রায়শঃই সম্মোহনকারীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বা আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে হয় এবং তাঁহার আদেশ ও ইঙ্গিত অনুসারেই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুভব করে। এই অবস্থা ও স্বাভাবিক স্বপ্নাবস্থার সাদৃশ্যও অনেক। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলিও যেমন স্মৃতি হইতে সহজেই বিলুপ্ত হয়, 'মুগ্ধ' ব্যক্তিরও তদবস্থায় অনুভূত ও প্রত্যক্ষীভূত বিষয় সমূহেরও সহজেই বিস্মৃতি ঘটে। মাদক দ্রব্যাদির প্রয়োগেও এক প্রকার নিদ্রা বা তন্দ্রা জন্মাইতে পারা যায়, এবং সেই মত্তাবস্থায় যে সমস্ত ব্যাপার 'দৃষ্ট' বা 'অনুভূত' হয়, তাহার সহিত স্বভাবজ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের

অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। সুরা, অহিফেন, গঞ্জিকা, কোকেন, ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি সেবনের পর যে নিদ্রা বা তন্দ্রা উপস্থিত হয়, তাহাতে যতটুকু বিজ্ঞান বা অনুভূতি জন্মে, তাহাও স্বপ্নতুল্য। মানসিক পীড়া বা মস্তিষ্ক-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থাও অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায়।

ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কারণ সমবায়েই স্বপ্ন বা তত্তুল্যাবস্থার উদ্ভব হয়।

স্বপ্নের কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে 'নিদ্রার' অর্থাৎ যে অবস্থায় স্বপ্নোৎপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

নিদ্রা কি? নিদ্রা শ্রান্তিদায়িনী, ক্লেশাপহা "Tired Nature's Sweet restorer, balmy Sleep—"শ্রান্ত মানবের মধুর সঙ্গিনী—বেদনানাশিনী।" দেহধারী সকলেরই নিদ্রার আবশ্যক। "আহারো নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভি-নরাণাম্।" নিদ্রার বিষয়—আমরা এক, শরীরের দিক্ দিয়া, অপর মনের দিক্ দিয়া—আলোচনা করিতে পারি। দেহ একটি যন্ত্র। যন্ত্রের স্থায়িত্ব ও কার্য্যকারিতা, 'বিশ্রামে'র উপরেই অনেকটা নির্ভর করে, যে যন্ত্র 'বিশ্রাম' ব্যতিরেকে অহর্নিশ পরিচালিত হয়, তাহা অত্যল্পকাল মধ্যেই ভগ্ন, বিকল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যন্ত্রের শক্তিও যেমন সীমাবিশিষ্ট, জীবদেহের শক্তিও তেমনি সসীম। যন্ত্র প্রতিনিয়ত পরিচালনা করিলে ও তাহার শক্তি-জনন-সীমা অতিক্রম করিলে, যেমন তাহা বিকল ও অকর্ম্মণ্য

হয়, দেহযন্ত্রও তদ্রূপ অবিচ্ছেদে পরিচালনা করিলে ভগ্ন হইয়া যাইবে। নিদ্রাই দেহযন্ত্রের বিশ্রাম।

নিদ্রায় প্রধানতঃ মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশীসমূহের বিশ্রাম ঘটে এবং তাহাতেই সমগ্র দেহযন্ত্রের বিশ্রাম লাভ হয়। কিন্তু জীবনী-শক্তিকে অব্যাহত ও ক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌ ও পাকস্থলীর ক্রিয়া মৃদুমন্দ গতিতে অনবরত চলিতে থাকে। আপনারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বাষ্পীয় যন্ত্র-সমূহের মুখ্য ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও যেমন পুনরায় বাষ্পোদ্গম-শ্রম-লাঘব জন্য অগ্নিকে একোবারে নির্ব্বাপিত করা হয় না; দেহযন্ত্রেরও আভ্যন্তরীণ অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় না। আর তাহা হইলেই ত মৃত্যু। বাষ্পের পুনরুদ্গম সম্ভব, কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে আর জীবনী-শক্তির পুনরুন্মেষ হয় না, সুতরাং নিদ্রাবস্থায়, দেহ-যন্ত্রগুলি একেবারে নিষ্ক্রিয় না হইয়া, মৃদু গতিতে চলিতে থাকে।

নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশীর বিশ্রাম দ্বারা উহাদের সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীলতার তিরোধান মনে করিবার কোন কারণ নাই। বহির্জগত জাগ্রতাবস্থায় স্নায়ু-পথে সর্ব্বদাই মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় তাহা করে না। এবং বিশ্রাম-লালসায় যাহাতে স্নায়ু উত্তেজিত না হয়, তজ্জন্য বিশ্রামের প্রশস্ত সময় 'রাত্রি'। চক্ষুর বিশ্রামের জন্য আলোকের অভাব বা অন্ধকারের প্রয়োজন, কর্ণের বিশ্রামের জন্য নিস্তব্ধতা বা নীরবতার প্রয়োজন,

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশ্রামের জন্য যথাসম্ভব গন্ধদ্রব্য ও তদ্বাহী বায়ুর অবাধ সঞ্চালন নিরোধ আবশ্যক।

ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে এবং ধরিত্রী তমিস্রাবৃতা হইলে, নিদ্রার প্রশস্ত কাল উপস্থিত হয়; গগনতলের উন্মুক্ত বায়ু-প্রবাহ-বর্জ্জিত গৃহাভ্যন্তরই নিদ্রার উপযুক্ত স্থান। অন্ধকার অপগত হইলে, পৃথিবী যখন পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের রবে মুখরিতা হইয়া উঠে, তখনই নিদ্রার অবসান হয়।

নিমীলিত চক্ষুর উপর সামান্য আলোকসম্পাতে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। কিন্তু উজ্জ্বল আলোকরশ্মি মুদ্রিত নেত্রের উপর পড়িলে গভীর নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া যায়। সামান্য শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, কিন্তু ঢক্কার তুমুল নিনাদে বা অন্য কোন বিকট শব্দে গভীর নিদ্রাও ভঙ্গ হয়। ইহা দ্বারা নিদ্রার অর্থ এই বুঝিতে হয় যে—জাগ্রতাবস্থার তুলনায় মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশী সমূহের ক্রিয়া-রাহিত্য বা বিশ্রাম বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম বা ক্রিয়ারাহিত্য নয়। নিদ্রার অবস্থায় মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশীসমূহের ক্রিয়া মৃদুভাবে চলিতে থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম—কেবল মৃত্যুতে 'যন্মরণং সোহস্য বিশ্রামঃ'। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যদি নিদ্রার অবস্থায়ও অতি মৃদুভাবে চলিতে থাকিল, তবে কি 'মনন-ক্রিয়া'ও তৎসঙ্গে অতি মৃদুভাবে চলিতে থাকে? যাঁহারা মস্তিষ্ককে মানবমনের অতি প্রধান যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা অবশ্যই মস্তিষ্কের মৃদু ক্রিয়ার সহিত মৃদু 'মননক্রিয়া'ও স্বীকার করিবেন। শরীর ও মন উভয়ের ক্রিয়াই যদিও মৃদুভাবে চলিতে থাকিল, তবে আর নিদ্রা কি এবং সুষুপ্তি

ও জাগরণে পার্থক্য কোথায়? অচৈতন্যই নিদ্রার প্রধান লক্ষণ। সংজ্ঞারাহিত্যই তাহার প্রধান চিহ্ন। ইহা কেহই বলেন না যে, আমরা সুপ্তাবস্থায় চিন্তা করি। এই আপত্তি নিরসনের জন্যই এই মতাবলম্বী কোন কোন পণ্ডিত এবংবিধ মৃদু মস্তিষ্ক-ক্রিয়াকে 'অচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়া' (unconscious cerebration) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই মৃদু মস্তিষ্ক-ক্রিয়া, নিদ্রাবস্থায় যদি চৈতন্যে ফুটিয়া উঠে, তখনই স্বপ্নদর্শন হয়।

অপরদিকে যে সমস্ত পণ্ডিতেরা মনকে সর্ব্বতোভাবে দেহাতিরিক্ত বলিয়া মনে করেন এবং মস্তিষ্ককে মনের অত্যাবশ্যকীয় প্রধান যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা নিদ্রাবস্থায়ও মনন ক্রিয়া চলিতে থাকা স্বীকার করেন এবং নিদ্রাবস্থার মনন বা চিন্তনের স্মৃতি না থাকা এবং জাগ্রতাবস্থায় চিন্তনের বা মননের স্মৃতি দেদীপ্যমান থাকাকেই, উভয়াবস্থার একমাত্র পার্থক্য লক্ষ্য করেন। ডেকার্ট ও লাইব্‌নিজ্‌ প্রমুখ মনীষীগণ এই মতাবলম্বী।

স্বপ্নের প্রকৃতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে, তাহার উৎপত্তির কারণ বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। স্বপ্নের এই কয়েকটি বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

১। নিদ্রা গাঢ় হইলে প্রায়শঃ স্বপ্নদর্শন ঘটে না। এবং নিদ্রার ব্যাঘাত (Disturbed sleep) হইলেই স্বপ্নদর্শন ঘটে।

২। সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে এবং নিদ্রাভঙ্গের প্রাক্‌কালেই স্বপ্নদর্শন ঘটে, চৈতন্য হইতে অচৈতন্যে

এবং অচৈতন্য হইতে চৈতন্যে যাওয়ার সময়ই স্বপ্নোৎপত্তির সময় বটে। ইহাই কবির 'অচেতনে চেতন' ও 'ঘুমন্তে জাগা'।

৩। স্বপ্নের স্মৃতি প্রায়শঃ বিলুপ্ত হয়, যত স্বপ্ন দেখা যায়, তার মধ্যে সামান্য দু একটাই মনে থাকে বা স্মৃত হয়।

৪। স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘটনা সমূহের অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য সমাবেশ ইচ্ছা ও বিচার-শক্তির যৎসামান্য 'কর্তৃত্ব'ই তৎপ্রতি কারণ।

৫। স্বপ্নাবস্থায় কল্পনা বেশ ক্রিয়াশীলা। জাগ্রতাবস্থায় কল্পনা—সংযতা, স্বপ্নে—নিরঙ্কুশা। ইচ্ছা ও বিচারের শাসন তিরোহিত হইলে, কল্পনাও উদ্দাম হইয়া উঠে।

৬। স্বপ্নের উৎপত্তি—শারীরিক অবস্থার উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কথায় বলে—'পেট্ গরম' হলেই স্বপ্নদর্শন ঘটে। পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াও অস্বাভাবিক হয়। নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহের যথাসম্ভব বিশ্রামলাভ না হইলে স্বপ্নোৎপত্তি হয়।

শরীর-তত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা দ্বারা স্বপ্নোৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। নিদ্রাকালে বিশেষ বিশেষ স্নায়ু, বাহ্যোপায়ে উত্তেজিত করিয়া, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বপ্নের উৎপত্তি ঘটাইয়াছেন। যথা:—নিদ্রিতের পদতলে শীতল সামগ্রীর স্পর্শ দ্বারা বরফরাশির উপর মসৃণতলপাদুকা-যোগে ভ্রাম্যমাণ (Skating) হওয়ার স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। দূরাগত মেঘগর্জ্জনের শব্দে, অনেক সৈনিক-পুরুষের রণক্ষেত্রের কামান

গর্জ্জনের স্বপ্নদর্শন হয়। গৃহের কপাটের শব্দে অনেকের চোর ডাকাতের গৃহ-প্রবেশের স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। শিয়রের উপাধান সরাইয়া, অর্থাৎ শিরোদেশ অবনমিত করাইয়া, মস্তকোপরি প্রস্তরখণ্ডের অবস্থান ও তৎপতনে মস্তক চূর্ণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা-সূচক স্বপ্নদর্শন ঘটে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রুড্ (Freud) 'স্বপ্ন' সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানি অতি উপাদেয় ও বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে সমস্ত স্বপ্নই স্মৃতির ন্যায়, পূর্ব্বানুভূত, পূর্ব্বচিন্তিত—পূর্ব্বদৃষ্ট-শ্রুত-ঘ্রাত-স্পৃষ্ট-আস্বাদিত ব্যাপার সম্পৃক্ত। অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, অশ্রুত-পূর্ব্ব, অনাঘ্রাত-পূর্ব্ব, অস্পৃষ্ট-পূর্ব্ব ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব বিষয়ের স্বপ্ন-রাজ্যে স্থান নাই।

যৎসামান্য ব্যাপার, যাহা কোন সময়ে সুদূর অতীতে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল অথবা পরিজ্ঞাত হইয়াছিল এবং যাহা বিস্মৃতির অতল-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাও নিদ্রাবস্থায় স্নায়ু-বিশেষের সামান্য উত্তেজনায় জাগিয়া উঠে এবং বিভিন্ন অবস্থার এবং সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ ও অসম্পৃক্ত অন্য ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, এবং ইহাই স্বপ্নের 'অদ্ভুতত্ব'। ইহা দ্বারা এই অনুমিত হয় যে, যাহা কখনও একবার মানসপটে কোনোভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহা কখনও মুছিয়া যায় না, প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায় মাত্র। শারীরিক অবস্থার সহিত স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাপারের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কোন রোগী পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে দেখিতেন যে, একটি বিড়াল তাঁহার গলদেশ চাপিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার

শ্বাসনিরোধ করিতেছে। কিছুদিন পরে দেখা গেল, সেই রোগীর কণ্ঠনালীর পীড়া (Cancer) উপস্থিত হইয়াছে, এবং অস্ত্রচিকিৎসক সেই রোগীর কণ্ঠনালীতে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মতই সমর্থিত হয় যে, শারীরিক অবস্থার উপরেই স্বপ্নের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বহুপরিমাণে নির্ভর করে।

স্বপ্ন-রাজ্যের সমস্ত দৃশ্যই 'অতিরঞ্জিত' ও ঘোর 'অত্যুক্তি' পূর্ণ (exaggerated)। বিচার-শক্তির বিশেষ অভাব, ইচ্ছা-শক্তির আংশিক বিলোপ, এবং ভাব ও অনুভূতির প্রাখর্য্যই তৎপ্রতি 'কারণ' বলিতে হয়। সামান্য আলোক-রশ্মি—প্রকাণ্ড দাবানল; ঘটিকা যন্ত্রের মৃদু 'টিক্, টিক্' শব্দ—বিকট ঢক্কানিনাদ; এবং যৎসামান্য শীতল স্পর্শ—প্রচণ্ড শৈত্য বলিয়া অনুভূত হয়। পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ, তুলনা এবং বিশেষতঃ বিচার-পূর্ব্বক অভি-নিবেশের অভাবেই এই 'অত্যুক্তির' উদ্ভব।

গুরু মহাশয়ের ক্ষণেক অনুপস্থিতিতে যেমন শিশু ও বালকবৃন্দ, পাঠ-গৃহকে নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকে পূর্ণ, লম্ফে ঝম্ফে টল্‌টলায়মান ও নানাশব্দে শব্দায়মান করিয়া তোলে, বিচার ও ইচ্ছাশক্তির শাসন শ্লথ হইলে, মানবের চিন্তা-শিশুসমূহও নিতান্ত নিরঙ্কুশ ও উন্মাদ হয়, ইহাই স্বপ্নের 'অত্যুক্তি'।

ইহা কেহ মনে করিবেন না যে 'স্বপ্নে', বিচার বা ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বতোভাবে রহিত হইয়া যায়; পরন্তু কোন কোন স্থলে, তাহাও 'অত্যুক্তিপূর্ণ' হয়। এ প্রকার দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে,

জাগ্রতাবস্থায় গণিতের যে সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন সমাধান করা যায় নাই, স্বপ্নাবস্থায় সমাধানপ্রয়াসী ব্যক্তি গাত্রোত্থান করতঃ সেই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু নিদ্রাপগমে সেই সমাধান স্মৃতি, একেবারেই থাকে না।

কণ্ডিলাক্‌এর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের * রচনা স্বপ্নাবস্থায় সমাহিত হইয়াছিল। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচার ও ইচ্ছাশক্তির অত্যন্তাভাব সূচিত হয় না।

শিশুরও স্বপ্নদর্শন হয়, নিদ্রাবস্থায় শিশুর হাস্য ও ক্রন্দন ইত্যাদি শিশু-জননী সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, ইহাকে শিশুর 'দেউলা' 'দেহেলা' করা বলে। পশ্বাদির যে স্বপ্নদর্শন ঘটে, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

পশুরও যে 'অবিকশিত' বা 'কিঞ্চিৎ বিকশিত' মন আছে, তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিবর্ত্তন-বাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্বীকার করিলে ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই।

ভ্রূণবিজ্ঞান (Embryology) প্রভৃতির সাহায্যে, মানবদেহ ও পশুদেহের সাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শিশুর মনেরও পশুর মনের সাদৃশ্যও স্বীকৃত। তবে পশুর স্বপ্নদর্শন বিচিত্র কি? যাঁহারা কুকুর পুষিয়া থাকেন এবং কুকুরের প্রকৃতি ও ব্যবহার মনোযোগের সহিত ও অনুসন্ধিৎসা সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন,

* Cours d' Etuder.

তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, নিদ্রিত সারমেয় (প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ) নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করে, শব্দ করে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে। সময়ে সময়ে স্বীয় স্বভাবসুলভ কলহ ও সমরপ্রিয়তার লক্ষণ প্রকাশ করে, আবার সময়ে সময়ে প্রভুভক্তির সেই গদ্‌গদ্ ভাবও তাহার বদন-মণ্ডলে প্রকাশিত হয়। যখন পশ্বাদির স্মৃতি ইত্যাদি মনোবৃত্তির অস্তিত্ব অবিসংবাদী, তখন আর তাহার স্বপ্নদর্শন অসম্ভব কিসে? জাগ্রতাবস্থায় অর্জ্জিত জ্ঞান, অনুভূতি ও ভাবের উপরেই যখন স্বপ্নের প্রকৃতি ও উৎপত্তি নির্ভর করিতেছে, তখন 'মনের' পরিধি, ব্যাপ্তি ও বিস্তার যৎটুকুই হউক্ না কেন, স্বপ্নদর্শন সকল শ্রেণীর মনেই সম্ভবে। মানব-শিশু ও পশু সকলেরই স্বপ্নদর্শন ঘটে।

দিবা-স্বপ্ন ইংরাজীতে যাহাকে day-dreams বা reverie বলে, তাহার বিষয়ও সকলেই অবগত আছেন। মানব-মন যখন বাস্তব জগতের কোন বিষয়বিশেষে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ না থাকে, ইচ্ছা যখন মনকে কোন লক্ষ্য বিশেষের দিকে প্রধাবিত না করে, তখনই 'দিবা-স্বপ্ন' উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 'ইতশ্চেতশ্চ,' ধাবমান মনে শৃঙ্খলা-বিরহিত নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হয়, কল্পনা নিতান্তই নিরঙ্কুশ হয়, এবং মনের এবংবিধ চিন্তা ও কল্পনাকেই দিবা-স্বপ্ন বলি। নিষ্কর্ম্মা ও অলস ভাবে যখন থাকি, তখনই মনের ইত্যাকার অবস্থা উপস্থিত হয় এবং ইত্যাকার অবস্থায়ই 'ঐশ্বর্য্যে ফাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা'।

এই শ্রেণীর কল্পনা এবং যে কল্পনার বলে, কবি কাব্য-সৃষ্টি করেন, চিত্রকর অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করেন ও শিল্পী নানাপ্রকারের কলা ও শিল্প সৃষ্টি করেন, তাহা এক নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনায়—উচ্চাঙ্গের বিচারণা ও ইচ্ছা-শক্তির প্রভৃত ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দিবা-স্বপ্নজ কল্পনায় তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, 'স্বপ্নে' কোন গুপ্ত রহস্য নাই, কোন অতিমানুষ-জীবের ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। দেহের ও মনের অবস্থা বিশেষের উপরই ইহার উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ভর করে।

মনের কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার আলোচনা দ্বারা, যেমন মনস্তত্ত্ববিদ্ মনের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন, স্বপ্ন বা তত্তুল্য ব্যাপারের আলোচনা এবং তাহার অনুধ্যানও সেই প্রকার মনস্তত্ত্ববিদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের সমগ্র জীবনই ত 'স্বপ্নে ঘেরা।' এবং "Our little life is rounded with a sleep."
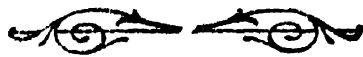
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"

প্রবৃত্তি—মত্তহস্তী, নিবৃত্তি—অঙ্কুশ। প্রবৃত্তি—স্রোত, নিবৃত্তি—বাঁধ। প্রবৃত্তি—গতিশীলা, নিবৃত্তি—স্থিরা। প্রবৃত্তি—রণরঙ্গিণী, নিবৃত্তি—শান্তিময়ী। এই সমস্ত রূপক ও উপমাদ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আমরা মানব-জীবনে প্রধানতঃ এই দুটি শক্তিরই ক্রিয়া দেখিতে পাই। প্রবৃত্তি মানবের, মানব সমাজের ও জগতের বাল্য জীবনের সখী, আর নিবৃত্তি পরিণত বয়সের সহচরী। মানব-শিশু বাল্যে যাহা কিছু করে, সমস্তই বাল-সুলভ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন। উজ্জ্বল, চাকচিক্যশালী যে কোন বস্তু, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আকাশের চাঁদ, গৃহের দীপশিখা, রন্ধনশালার অগ্নিই তাহার দর্শনীয়। গুরু ও গম্ভীর যে কোনো শব্দে তাহার কর্ণাকৃষ্ট হয়; মেঘের গর্জ্জন, গাভীর হাম্বারব, ঢাকের শব্দে শিশু আকৃষ্ট। যাহা কিছু সুমিষ্ট, তাহাই তাহার আস্বাদনীয়। তখনও নিবৃত্তির সহিত শিশুর পরিচয় ঘটে নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন চাঁদের দূরবর্ত্তিতা সুতরাং দুর্ল্লঙ্ঘনীয়তা অনুভব করিল, যখন প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার দাহিকাশক্তি অনুভব করিল, তখন হইতেই

নিবৃত্তির সাহচর্য্য লাভ বাঞ্ছনীয় হইল। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই এক উদ্দেশ্য—দুঃখের বিনাশ ও সুখের উৎপত্তি। সুখাকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি, স্বীয়মার্গে মানবকে লইয়া দুঃখে নিপতিত করিলে, সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই নিবৃত্তি, প্রবৃত্তিমার্গ পরিহার করিতে উপদেশ দেন, সুতরাং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি হইতেই সমুদ্ভূতা। মানব মনে ইচ্ছাশক্তির ক্রম-বিকাশ ও সেই প্রাথমিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি হইতে কায়িক সুখের বৃদ্ধি ও কায়িক দুঃখের বিনাশেই প্রথম প্রকটিত হয়। দীপশিখায় শিশুর ছোট হাতখানি দিলে পুড়িয়া যায় ও কষ্ট পায়, সেই জ্ঞান হইতে দীপশিখার নিকটবর্ত্তী না হওয়ার ইচ্ছা প্রথমে বিকশিতা হয় এবং এই ইচ্ছা-শক্তিটুকুর এবংবিধ প্রকাশই নিবৃত্তি। দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শিশু অগ্নির নিকটবর্ত্তী হয়, স্পর্শেন্দ্রিয়ও স্বীয় চরিতার্থতা লাভের জন্য তদভিমুখে প্রধাবিত হয়, কিন্তু পরে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের উদয় হওয়ায় অগ্নির দর্শন ও স্পর্শনরূপ প্রবৃত্তি নিরোধ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই ত নিবৃত্তির আদিম ইতিহাস ও জন্ম বিবরণ। প্রবৃত্তি জড়াবলম্বিনী, অর্থাৎ জড়কে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে; নিবৃত্তি বিজ্ঞানাবলম্বিনী, অর্থাৎ বিজ্ঞানই নিবৃত্তির আশ্রয়ভূমি। জড় জগতের আণবিক আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি অনেক পরিমাণে প্রবৃত্তির ন্যায়ই কার্য্য করে। শোভন-দ্রব্যে নয়নাকৃষ্ট হয়, শ্রুতি-সুখকর শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, মধুর সামগ্রী রসনা পরিতৃপ্ত করে, মসৃণ পদার্থ স্পর্শ করিলে সুখানুভব হয়, সৌরভ-বিশিষ্ট পদার্থে নাসিকার তৃপ্তি হয়। ইন্দ্রিয়-

প্রবৃত্তিগুলিও আদিম অবস্থায় জড় জগতের আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণের ধর্ম্মবিশিষ্টা। এই আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ যতই জড়-নিরপেক্ষ হয়, ততই নিবৃত্তিত্বে পরিণত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিই নিবৃত্তি। জড়াভিমুখিনী প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিয়া, আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে প্রধাবিত করিতে পারিলেই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়, সুতরাং কতকগুলি আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ ধর্ম্মাবলম্বিনী আদিম প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রায় সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর প্রবৃত্তিই নিবৃত্তিমূলা। হিন্দু দর্শনের যোগও প্রকৃত প্রস্তাবে এই নিবৃত্তিরই সাধনা ও অনুশীলন। সংযম, নিবৃত্তি, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়ই একার্থবোধক। যখন নীচ প্রবৃত্তির আবিল স্রোত ভয়ঙ্কর বেগে বহিতে থাকে, তখন সহজে সে স্রোতের গতি নিরোধ করা যায় না। এই প্রকার প্রবৃত্তি-প্রবাহ স্থায়ীরূপে নিরোধ করিবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন; তাঁহারা প্রবৃত্তির স্বাভাবিকতা কদাপি অস্বীকার করেন নাই,—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং" ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শৈশবে যে সমস্ত প্রবৃত্তির বেগ অত্যন্ত প্রবল মনে হয়, যৌবনে তাহা মন্দীভূত, যৌবনে যাহা প্রবল, বার্দ্ধক্যে তাহা দুর্ব্বল। মানব সমাজের কথাও তাই। অসভ্য জাতির মধ্যে যে সমস্ত প্রবৃত্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, অর্দ্ধ সভ্য জাতির মধ্যে তাহা পরিদৃশ্যমান হয় না; আবার অর্দ্ধ সভ্য জাতির মধ্যে যে সমস্ত প্রবৃত্তির বেগ দুর্দ্দমনীয়, সুসভ্য জাতি সমূহের মধ্যে তাহার ক্রিয়া মন্দীভূতা। মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক

জীবনের ইতিহাস প্রায় একরূপ। প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিলে অধঃপতন অথবা অধঃপতিত অবস্থায় অবস্থান, আর নিবৃত্তিমার্গে উন্নতি। তবে এই নিবৃত্তির কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, সামাজিক জীবের পক্ষে সন্ন্যাস সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ ও বিকাশের জন্য নিবৃত্তি যে মহাফলা, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নিবৃত্তির অনুশীলনে ইচ্ছা-শক্তির বৃদ্ধি হয়, মানবের প্রকৃত ক্ষমতার প্রসার হয় এবং মানব জীবন প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। মিল্টনের "স্বর্গভ্রংশ" কাব্যে সয়তানের উক্তির যে এত প্রশংসা, তাহাও ঐ দুর্দ্দমনীয়া ইচ্ছা-শক্তির মহিমা ঘোষণা করে বলিয়া—

"What though the field be lost ?
All is not lost, the unconquerable will,
And study of revenge, immortal hate."

প্রবৃত্তি কখনও মত্তমাতঙ্গ-বিক্রমে, মানবকে আক্রমণ করিতে পারে, কিন্তু নিবৃত্তির অঙ্কুশ-তাড়নে সে মত্ততা বিদূরিত হয়। জড়-শক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, অঙ্কুশ-হস্ত মাহুত মাতঙ্গের তুলনায় নগণ্য, কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবেই মাহুত ঐ প্রচণ্ড জড়-শক্তিকে স্ববশে আনয়ন করে। কেহ কেহ বলেন জগতে যত শক্তিরই ক্রিয়া দেখিতে পাই, সমস্তই সেই ইচ্ছা-শক্তির রূপান্তর ও নামান্তর। জড়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে অন্ধ বলি, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানে সংশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে ইচ্ছা-শক্তি বলি। বৌদ্ধধর্ম্মের ও দর্শনের শিক্ষাও তাহাই। কয়েক জন জার্ম্মান-পণ্ডিত এই মত অবলম্বন করিয়া বিপুল দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

(শ্রুতি)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সাধনই মানব-জীবনের লক্ষ্য। এই বর্গ চতুষ্টয়ের শ্রেষ্ঠতম 'মোক্ষ', অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে লাভ করিতেও বলের বা শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং শ্রুতি বলিতেছেন যে, বলহীনের পক্ষে সেই পরমাত্মাকে লাভও অসম্ভব। মুমুক্ষু জীবের বলীয়ান্ ও শক্তিশালী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কেন না বলহীনের মোক্ষলাভ হইতে পারে না। অপর বর্গত্রয় লাভে, বলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস অনাবশ্যক, কারণ তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। শ্রুতি-বাক্যদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই পরমপদ লাভের জন্যও বলের প্রয়োজন। দুর্ব্বলের পক্ষে পরমপদ লাভ (Realization of the highest self) অসম্ভব। ব্যক্তির পক্ষে এই শ্রুতি-বাক্য যে পরিমাণে সত্য ; জাতির পক্ষেও তদ্রূপ। সেই বল কি ? তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'বল' বা 'শক্তি'র দার্শনিক লক্ষণ স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, 'বাধা সহ্য করার অথবা বাধা দূর করিবার ক্ষমতাই' বল। বলের পরিচয় অনেকে ভার-সহন-ক্ষমতা হইতে অনুমান করিয়া থাকেন।

স্যাণ্ডো প্রভৃতি কায়িক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা, কে কত মন ভার উত্তোলন করিতে পারেন, তাহা হইতেই বলের তারতম্য স্থির করেন। 'বল' বা শক্তি যদিও বিজ্ঞানের চক্ষে এক, তথাপি আমরা মানবজীবনের বিভাগ অনুসারে 'শক্তি'কে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া দেখি।

যাহাকে 'জীবন-সংগ্রাম' বলা হয়, তাহাকে 'শক্তি-সংঘর্ষ'ও বলা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে নানাশ্রেণীর শক্তির মধ্যে অহর্নিশ সংঘর্ষ চলিতেছে ; অল্প শক্তিসম্পন্ন, অধিক বলসম্পন্নকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই পরাভূত হইতেছে ; সমস্ত বিশ্বময় এই শক্তি-সংঘর্ষ। দুর্ব্বল জাতি প্রবল জাতিকর্ত্তৃক নিপীড়িত, নিগৃহীত ও বিতাড়িত হইতেছে। কোনো কোনো জাতি পরাক্রান্ত জাতিকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, ক্রমে ক্রমে ধরাধাম হইতে একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা হইতে অনেকেই প্রকৃতির 'নৈষ্ঠুর্য্য ও নির্ম্মমতা' অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি যে ভাবে এই শক্তিলীলা অবলোকন করুন, জগতে যে সর্ব্বতোভাবে শক্তির মহিমাই পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মনোজগতেও যে সেই শক্তির অবিরাম খেলা চলিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেব ও অসুরগণের দ্বন্দ্ব, সুভাব ও কুভাবের কলহ, সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির বিরোধ, 'হরমাজ্‌দ্‌' ও আহিরমানে'র দ্বন্দ্বত নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সেই একই কাণ্ড।

অতএব বল লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতিকেই অবহিত হইতে হইবে।

আজকাল এই ভারতবর্ষে অভিনব জাতীয় জীবনের সূচনা হইয়াছে বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। কিন্তু আমরা যে বলহীন ও শক্তিহীন! সেই অভীপ্সিত জাতীয় জীবনলাভ করিতে হইলে বলের প্রয়োজন। বল বা শক্তি সঞ্চয় ব্যতীত সেই পরম পদ লাভ হইবে না।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" জাতীয় জীবনলাভের যত চেষ্টা, সমস্তই প্রকৃত পক্ষে বল লাভের প্রয়াস। বল লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দুর্ব্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহা দূর করিতে হইবে। পরে যাহাতে বল বৃদ্ধি হয়, সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

নৈসর্গিক কারণে অর্থাৎ জল বায়ু প্রভৃতির দোষেই যদি আমরা দুর্ব্বল হইয়া থাকি, তবে যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে সেই দোষ পরিহার করা যায়, তাহাই করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমরা কি কোন চেষ্টা করিতেছি?

বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও পুষ্টিকর আহার্য্যের জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে? সংক্রামক পীড়া নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে? স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার কি কোন আয়োজন চলিতেছে? যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথায় আমরা ক্রমে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতেছি, তাহার উন্মূলনের জন্য কয়জন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন?

উপযুক্ত ব্যায়াম ও দেহ সঞ্চালন প্রভৃতিদ্বারা শরীরকে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য কি বিশেষ কোনো চেষ্টা হইতেছে?

নব জীবন লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে 'শক্তি'র সাধনা আবশ্যক। শারীরিক শক্তি—মানসিক শক্তি লাভেরই সোপান এবং মানসিক শক্তিই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের উপায়; যতদিনে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হইবে, ততদিন 'নবজীবন' লাভ অসম্ভব। সেই ঋষি বাক্য সর্ব্বদাই আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—'**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ**।' বল সঞ্চয় কর,—শক্তিশালী হও; সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-মুক্ত হইয়া, পরমপদ লাভ করিবে।

আমরা নির্ধন। ধন লাভ বা শক্তি লাভ একই কথা। দুর্ব্বল জাতি কবে ধনশালী হইয়াছে? ধন (Wealth)ই সেই অশরীরী শক্তির বহিঃপ্রকাশ (Symbol). বুয়রগণ প্রভৃত কায়িক শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংলণ্ডের ধনবলের নিকট মস্তক অবনত করিল। ইংরেজগণ এক ধনবলেই আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল করিয়া ফেলিতে পারেন। নির্ধন বলিয়াই আমরা অনশন ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, ব্যাধিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও প্রতিযোগিতায় অসমর্থ। 'স্বদেশী প্রচেষ্টা'ও এই ধনবল লাভেরই চেষ্টা। ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতিরকে ধন বৃদ্ধির আশা নাই এবং এই বল ব্যতিরকেও সেই বাঞ্ছিত 'পরমপদ' লাভ হইবে না। নির্ধন বলিয়াই আমরা সরকারী চাকুরীর মায়াপাশ

ছেদন করিতে পারিতেছি না! অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে ক্ষীণতনু ব্যক্তির পক্ষে কি চাকুরী ত্যাগ সম্ভব?

আমরা যৌবন অতিক্রম করিলে কি আর সেই তেজ, সেই বীর্য্য, সেই উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিব? পুত্রকলত্র পরিবৃত হইয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া—অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের যুবকগণ কি আর সেই প্রকার তেজশালী ও উৎসাহশীল থাকিবে? তাহারা ক্রমশঃ বলহীন হইবে! তাহাদের এই বলহীনতার প্রধান কারণ যে বাল্য-বিবাহ, সেই কুপ্রথা রহিতের জন্য সমাজে কি চেষ্টা হইতেছে? এত বড় একটা আন্দোলনের ফলে, কয়জন যুবক দেশের জন্য চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছে? কয়জনে সন্তান সন্ততি পরিবৃত না হইয়া, দেশের দারিদ্র্যের ভার লঘু করিতে সচেষ্ট হইয়াছে? শিক্ষা সম্বন্ধীয় যত পদ্ধতিই অবলম্বিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কায়িক বল লাভের জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা হইতেছে কি? সর্ব্বদেশেই শারীরিক বল লাভের প্রয়াস 'জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্নিবিষ্ট (Regular system of physical culture)। রীতিমত এই শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত, কোন উন্নতিরই আশা করা যায় না। স্থানে স্থানে যুবকগণ ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করিয়া দৈহিক বল লাভের চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু এই চেষ্টা যতদিনে 'জাতীয় শিক্ষা' পদ্ধতির অঙ্গীভূত না হইবে, ততদিন জাতীয় উন্নতি-কল্পনা বৃথা।

একাগ্রতা, স্থৈর্য্য, দৃঢ়-চিত্ততা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণে সভ্য সমাজ অলঙ্কৃত, সেই সমস্ত মানসিক বল লাভের জন্য আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে কি কোন উপায় পরিলক্ষিত হয়? যাহারা সামান্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ, সামান্য বিপদে অভিভূত, সামান্য আপৎপাতে বিগত-ধৈর্য্য, তাহাদের পক্ষে 'পরমপদ লাভ' সুদূর-পরাহত। এই সমস্ত মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার না করিতে পারিলে, আমরা কখনও সেই আকাঙ্ক্ষিত মোক্ষ লাভ করিতে পারিব না। বল লাভের জন্য আমরা কি করিতেছি? শারীরিক বল নাই বলিয়াই, আমরা পাশ্চাত্যগণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-মন্দিরে লব্ধপ্রবেশ হইয়াও তাঁহাদিগের মানসিক বলের অধিকারী হইতে পারি নাই। আর আমরা যে অনেক সময়ে আমাদের 'আধ্যাত্মিকতা'র বড়াই বা অহঙ্কার করি, তাহাও এই মানসিক বলের অভাবে ব্যর্থ হইতেছে। আমরা সর্ব্বদাই 'তৃণের ন্যায় নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হইতে পারি, কিন্তু কদাপি আধ্যাত্মিক 'রুদ্রতেজ' লাভ করিতে পারিতেছি না। একের অভাবে, অপরটি লাভের বিঘ্ন ঘটিতেছে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা অনেক সময়েই দূষণীয় ভাব-প্রবণতায় (morbid sentimentality) পরিণত হইতেছে। ভক্তিতত্ত্ব অতি সহজেই দেশের লোকের অধিগম্য, কিন্তু সেই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ আমাদের বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। 'স্বদেশ-প্রীতি'র ভিতরে অসার ভাবুকতা যতটুকু, তাহা সহজেই আমাদিগের মধ্যে উন্মেষিত হয়; অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গীত শুনিলে, ভাবে বিভোর হইয়া পড়ি।

অশ্রুপাত, রোমাঞ্চ প্রভৃতি মহাভাবের যে সমস্ত লক্ষণ বৈষ্ণব ভক্তিগ্রন্থে উল্লেখ আছে সমস্তই উপস্থিত হয়; কিন্তু ইহাতে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকের হৃদয়ে যে তেজ ও বীর্য্যের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, তাহার উদ্রেক কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইবে। শক্তির উপাসনা ও শক্তির সাধনা প্রচলিত থাকিয়াও, এই দেশের জল বায়ুর গুণে তাহা অতি জঘন্য ইন্দ্রিয় সেবায় পরিণত হইয়াছে। বল ও বীর্য্যের সাধনা করিতে করিতে নিরীহ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ও যে প্রকাণ্ড সামরিক জাতিতে পরিণত হইতে পারে, শিখ জাতির ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের চিন্তনেও আমরা তাঁহার অসীম বীর্য্য ও অমিত শক্তির বিষয় একটুও কল্পনা করিতে পারি না। আমরা সাধনা করি,—শান্ত, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি ভাবের। ভগবানের বীর্য্যবত্তার দিকেই যাই না। সে সাধনার দিকে একটুও অগ্রসর হই না।

কিন্তু আবার যখন অনন্ত হিন্দুশাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করি, তখন দেখিতে পাই যে, যখন বীর্য্যের আদর ছিল—যখন ধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে হইত, তখনকার ধর্ম্মশাস্ত্র "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"।

ভগবান্ স্বয়ং শোকে মুহ্যমান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মে ও বীর্য্য প্রদর্শনে প্ররোচিত ও প্রোৎসাহিত করিবার জন্য, দর্শনশাস্ত্রসমূহের সার কথার উল্লেখ করিয়া কতই উপদেশ দিয়াছেন। এমন কি, 'মনুষ্যত্ব' পরিহার করিয়া রমণীজনোচিত ভাবপ্রবণতার জন্য কত তিরস্কার করিয়াছেন।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

হে পার্থ, ক্লীবের ন্যায় আচরণ করিও না। মানুষের মত ব্যবহার কর, তোমার ন্যায় লোকের এই শোক-বিহ্বলতা বড়ই অশোভন। তুমি হৃদয়ের এই সামান্য দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া, মানুষের ন্যায় দণ্ডায়মান হও।

এই ভগবদুক্তির মধ্যে morbid sentimentality বা অসার ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়া, বিধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই যে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য— তাহাই গীতার ধর্ম্ম, তাহাই গীতার শিক্ষা। বোধ হয় জগতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে এই প্রকার 'রুদ্রানুবর্ত্তনে'র উপদেশ নাই। কিন্তু যুগব্যাপী দাসত্বে শিথিল-মেরুদণ্ড ভারতবাসী আর গীতার ধর্ম্মের অনুসরণ করে না। বৃন্দাবন-লীলার মাধুর্য্যেই তাহারা মুগ্ধ।
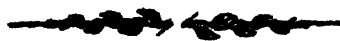
দার্শনিক কুলচুড়ামণি হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের তিরোভাব

পার্থিব জীবনের সন্ধ্যাকালে, মৃত্যুর অন্ধকারময়ী করাল মূর্ত্তির ধ্যান অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, পথিকের মনে স্বতঃই সেই দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পিত চিত্র মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক-কুলশিরোমণি স্বর্গীয় হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞান-সম্পদ লইয়াও শেষ জীবনে, মৃত্যু চিন্তায় অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ 'তথ্য ও ভাষ্যে' (Facts and Comments) লিখিয়াছেন :—

Old people must have many reflections in common. Doubtless one which I have now in mind is very familiar. For years past, when watching the unfolding buds in the spring there has arisen the thought—shall I ever again see the buds unfold ? Shall I ever again be awakened at dawn by the song of the thrush ? Now that the end is not likely to be long postponed, there results an increasing tendency to meditate upon ultimate questions. অর্থাৎ :—

বয়োবৃদ্ধগণের চিন্তা-স্রোত অনেক সময়ে একই খাতে প্রবাহিত। এক্ষণে আমার মনে যে চিন্তার উদয় হইতেছে, তাহা অনেকেরই

নিকট সুপরিচিত। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ, বসন্তাগমে কুসুম-কোরকের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিতে করিতে 'এই সমস্ত কোরক প্রস্ফুটিত হইতে কি আর দেখিতে পাইব? উষাকালে কলকণ্ঠ বিহগের গানে কি নিদ্রা হইতে আবার জাগরিত হইব?' এই চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইয়াছে; যতই জীবনের অবসান নিকট-বর্ত্তী হইতেছে, এই সমস্ত পরিণামচিন্তা চিত্তকে ততই অধিক অভিভূত করিতেছে।

খৃষ্টীয় ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে প্রচারিত গ্রন্থে স্পেন্সার ইহা লিখিয়াছেন এবং ১৯০৩ সনে অনন্ত মহাশক্তি-প্রসূত তাঁহার ব্যক্তিত্ব সেই মহাশক্তিতেই লীন হইয়াছে। (At death its elements lapse into the Infinite and Eternal Energy whence they were derived).

তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত মৃত্যুর তমোময়ী রজনীর গভীরতা ভেদ করিয়া তাঁহাকে আলোক ও শান্তি দিয়াছিল কি না, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু এই পরিণাম-চিন্তা হইতেই ইহা মনে হইতেছে যে, জ্ঞানীও মানব, মূর্খও মানব। মানব-প্রকৃতি-সুলভ কতকগুলি চিন্তা, সন্দেহ, ভয়, বিস্ময় ও আশা সকলের মনেই উদয় হইবে। জীবন-সমস্যার সমাধান সম্ভব হইলেও সকলের নিকট তাহা প্রীতিকর নহে।

যে মহাপুরুষ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া, তাঁহার বিপুল দৃষ্টিতে জগৎ-রহস্য বিলোকন করিয়াছেন এবং তৎসমাধানে তাঁহার

উজ্জ্বলতম প্রতিভা ও ধীশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগকে সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞানের যুগ বলা যাইতে পারে, সুতরাং বর্ত্তমান যুগের দর্শন ও মনোবিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে অনুশীলিত। দুর্জ্ঞেয় অথবা অজ্ঞেয় সৃষ্টি-রহস্য, পরিণামবাদ, মূলতত্ত্ব, পরাবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা প্রাচীন দর্শনের বিশেষত্ব। আধুনিক দর্শন নানাশ্রেণীর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সমীকরণ, বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-বিভাগে নিয়োজিত। প্রাচীন দার্শনিকদিগের অবলম্বিত মার্গ অনেক জার্ম্মাণ দার্শনিকও অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেকের মতে ইংলণ্ড জড় বিজ্ঞানের দেশ। ইংরাজেরা বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত। ভূত ও ভবিষ্যতের আলোচনায় তাঁহাদের কার্য্যকরী বুদ্ধি ও প্রতিভা বিনিয়োজিত হইতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং ইংলণ্ডে দর্শনালোচনা ও উচ্চশ্রেণীর দার্শনিকদিগের অভ্যুদয় সম্ভব নহে। পাশ্চাত্য দেশের জর্ম্মাণি প্রভৃতি ভূখণ্ডের তুলনায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সম্বন্ধে এ কথা অনেক পরিমাণে সত্য। প্রাচ্যদিগের সহিত নানা প্রকারে ইংলণ্ডই সংসৃষ্ট, কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনা জর্ম্মাণিতে যে প্রকার অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইংলণ্ডে তাহার শতাংশের একাংশও নহে। কর্ম্মশীল ইংরাজ, তত্ত্বালো-চনায় সময় ক্ষেপণ করিতে চাহেন না। যদিও স্পেন্সার প্রাচীন দার্শনিকদিগের পন্থা অবলম্বন করেন নাই, তথাপি একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ডে দার্শনিক পদবাচ্য। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের

আলোচনা ও অনুসন্ধান, জড়বিজ্ঞানের কোন এক বিভাগের অনুশীলন, দার্শনিক প্রতিভার কার্য্য নহে। দার্শনিক প্রতিভা, একদৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাংশ পর্য্যবেক্ষণ করে। বিষয়বিশেষে সেই দৃষ্টি সংনিবদ্ধ না হইয়া, সর্ব্ববিষয়ে ব্যাপ্ত রহিবে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য জীবদেহ-তত্ত্ববিদ্ হাক্সেলী, স্পেন্সার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "স্পেন্সার আমাদিগের আলোচনা ও অনুসন্ধানের সমস্ত ফলগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা একত্রে সাজাইয়াছেন—He picked all our brains and then he put it together"

অর্থাৎ ঃ—বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। জগৎ-রহস্যের একাংশের আলোচনা ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানরাশি শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশ বিজ্ঞানের কার্য্য; অথচ সমস্ত জগৎ-রহস্যের একত্রে আলোচনা ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানরাজিকে সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটনে নিয়োগ করা দর্শনের কার্য্য। দর্শনের এই ব্যাপ্তি ও পরিধির বিষয় চিন্তা করিলে, ইংলণ্ডে যে দার্শনিকদিগের সংখ্যা, অন্যান্য সুসভ্য দেশের তুলনায় অতি অল্প, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তত্ত্ব-বিদ্যাবিদ্ অনেকে দর্শনের আধুনিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদিগের মতে মূল ও আদি কারণের অনুসন্ধান ও অনুধ্যানই দর্শনের কার্য্য। চিৎ-শক্তি ভিন্ন জড়শক্তির আলোচনা দর্শনের কার্য্য নহে। সুতরাং তাঁহাদিগের অনেকের মতে স্পেন্সারও দার্শনিক নহেন এবং তৎ-প্রণীত গ্রন্থাবলী দর্শনশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

কোমৎ মতাবলম্বী পণ্ডিতপ্রবর ফ্রেডারিক হেরিসন্ সাহেব বলেন—"The learned metaphysicians who called themselves philosophers even denied the title of philosopher to Spencer, because he had not spent a lifetime in all the vague subtleties of German philosophy."

অর্থাৎ—পণ্ডিতমানী তত্ত্ববিদ্যানুশীলনকারী কোন কোন ব্যক্তি স্বর্ম্মাণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তাঁহার সমস্ত জীবন দর্শনের সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট বিষয়ের আলোচনায় ক্ষেপণ করেন নাই বলিয়া স্পেন্সারকে দার্শনিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে প্রস্তুত নহেন।

কিন্তু যদিও স্পেন্সার তাঁহাদিগের মতে দার্শনিক না হউন, তাঁহার গ্রন্থাবলী বর্ত্তমান যুগের অপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্র। স্পেন্সারের দর্শনের উপযুক্ত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার ঋষিতুল্য চরিত্র ও জীবনের কোন কোন অংশ ও তাঁহার প্রচারিত প্রধান প্রধান মতগুলি পাঠকদিগের নিকট উপস্থাপিত করাই আমাদের লক্ষ্য।

তাঁহার স্বরচিত জীবন-বৃত্তান্ত অল্পদিন মধ্যে জগতে প্রচারিত হইবে। তাহাতে যে সমস্ত গূঢ় কথা থাকিবে তাহা অদ্যাপি সাধারণের জানিবার সাধ্য নাই। কিন্তু নানাপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার সুযোগ ও সুবিধা থাকিতে, স্পেন্সার তাঁহার জীবন কি জন্য ও কি প্রকার কঠোরব্রতের উদ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার এই দীর্ঘ জীবনে, কদাপি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন্ নাই। চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক সরস্বতী-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। দার্শনিক আলোচ্য বিষয়ের নীরসতা ও কঠোরতা দেখিয়াই অনেকে দার্শনিকদিগকে কঠোর, নির্ম্মম ও নীরস বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মেদমাংস-শোণিতসম্পন্ন মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া, এই প্রকার জীবন কয়জনে যাপন করিয়াছেন? কয়জন দার্শনিক চির-কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী? আর বাস্তবিক কি তাঁহার কোমল বৃত্তি নিচয়ের অভাব ছিল?

কোন বিজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "তাঁহার হৃদয় কোমল ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। বৃদ্ধা জননীর সেবা করিতে করিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং তাঁহার মাতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়া।'

তাঁহার শারীরিক দুরবস্থা দেখিয়া অনেক বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে পরামর্শ দিয়াছেন, অন্যের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানী হাক্সেলি বলিয়াছিলেন যে, স্পেন্সারের পরিণয়রূপ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্পেন্সারের মতে দুর্ব্বল ও পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিবাহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হওয়া মূর্খতা। হয়ত তাঁহার আদর্শ প্রেমাধিকারিণী নারীসমাজে দুর্লভ হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে মেরিয়ান্ ইভান্সের—জগৎ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়টের সহিত তাঁহার যে প্রকার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, স্পেন্সার সেই বিদুষী রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলে, সহজেই তাঁহার পাণিপীড়ন

করিতে পারিতেন। তাহা হইলে প্রকৃত মণিকাঞ্চন যোগ হইত। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে, তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়াই তিনি উদ্বাহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হন্ নাই। যে একাগ্রতা, যে শ্রমশীলতা ও যে যোগীকল্প জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়া জগদ্বাসীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়াই ব্রহ্মচারীর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রূপ ও ভোগ-তৃষ্ণা তিনি সম্পূর্ণরূপে সংযমিত করিয়াছিলেন। অপর দিকে সম্মান লালসার বিষয় চিন্তা করুন। রাজদ্বারে ও সুধী সমাজে প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করিতে কে ব্যাকুল না হয়? স্পেন্সার ইচ্ছা করিলে, পৃথিবীর সুধীবর্গ তাঁহাকে কত উপাধিতেই না বিভূষিত করিতেন! রাজ দ্বারে সম্মান আকাঙ্ক্ষা করিলে তিনি কত প্রকারেই না সম্মানিত হইতেন! অযাচিতরূপে কত উপাধি প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে; তিনি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে দুইজন মনস্বী উপাধিমণ্ডিত হইতে চান্ নাই—এক, মহাত্মা গ্লাডষ্টোন, অপর, পুরুষশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট স্পেন্সার। আমাদিগের বর্ত্তমান সম্রাট তাঁহার রাজ্যাভিষেক কালে ও তৎপ্রতিষ্ঠিত নূতন উপাধিতে (Order of Merit) স্পেন্সারকে বিভূষিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। এই প্রকার মহাপুরুষকে ঋষি বলিব না ত কাহাকে তৎসংজ্ঞায় অভিহিত করিব?

তারপরে তাঁহার ধৈর্য্য ও অসাধারণ ত্যাগস্বীকার। এমন দিন গিয়াছে যে, তৎপ্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থাবলী জগতে তাঁহাকে অমরপদবীতে স্থাপন করাইয়াছে, তাহা প্রচার করিতে একজন প্রচারক যোটে নাই। জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যে গ্রন্থ যত্ন সহকারে অধীত হইতেছে, তাহার পাঠকসংখ্যা অতি যৎসামান্য ছিল। পনর বৎসর যাবৎ তিনি প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতে লাগিলেন, তথাপি অসীম ধৈর্য্যসহকারে গ্রন্থরাজির প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর বরপুত্রগণ যে কমলার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত, তাহা ত সকলেই জানেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন। স্পেন্সারের এই প্রকার আর্থিক কষ্ট সহ্য করা কি ধৈর্য্যশীলতারই পরিচয় দিয়াছে! অবশেষে কোন অযাচিত সাহায্যে তাঁহার এই অর্থকৃচ্ছ্র অনেক লাঘব হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ জীবনেই তিনি সর্ব্বতোভাবে এই দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রাচীন গ্রীক ও লাটীন ভাষা শিক্ষা না করিয়া কেহ 'শিক্ষিত' পদবাচ্য হইতে পারেন না। গ্রীক ও লাটীন ভাষায় লব্ধপ্রবেশ না হইলে কেহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান পাইতে পারে না। অনেক সাহিত্যিক, গ্রীক ও লাটীন ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, গ্রীক ও লাটীন ভাষা না জানিলে বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে বা বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে যে

প্রকার ধারণা, ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগেরও সেই ধারণা। স্পেন্সারও গ্রীক ও লাটিন জানিতেন না, কিন্তু তিনি যে প্রকার ব্যাকরণ ও রুচিসঙ্গত পরিমার্জ্জিত ভাষায় তাঁহার গ্রন্থরাশি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ঐ পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডিত হয়। জ্ঞানাভিমানী সাহিত্যিক মেথ্ আরণল্ডও স্পেন্সারের গ্রন্থগুলিকে সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু স্পেন্সার Style শীর্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিতমানী আরণল্ডের কতকগুলি ব্যাকরণদুষ্ট রচনার কষ্টকল্পনা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, স্পেন্সারের দর্শনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বর্ত্তমান যুগে 'বিবর্ত্তন বাদ' বা 'ক্রম-বিকাশ' বাদের উল্লেখ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সর্ব্বত্রই এই নূতন মতের আলোচনা ও উল্লেখ পরিলক্ষিত হইবে।

প্রাণীতত্ত্ব, জীবদেহতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব কি জড়-বিজ্ঞানের অন্য যে কোন অংশের আলোচনা করিয়াই 'বিবর্ত্তন-বাদ' জগতে প্রচারিত হইয়া থাকুক, স্বর্গীয় ডারউইনের নামের সহিত এই মতটি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত। ওয়ালেস্ কি ডারউইন কি অন্য কোন মহাপুরুষ এই মত জগতে সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিয়া থাকুন, সে বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, কি প্রকারে এই মতটি জাগতিক সর্ব্ববিধ ব্যাপারে ও বিষয়ে প্রযুক্ত হইল তাহাই দেখা যাউক। ডারউইন. জীব-জগতে নিম্নস্তরের জীব যুগে যুগে কি প্রকারে

বিবর্ত্তিত হইয়া ঊর্দ্ধস্তরে নীত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আলোচনা ও গবেষণা অন্যান্য বিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু স্পেন্সার এই বিবর্ত্তনপ্রণালী জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের অত্যন্ত আদিম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, অদ্য পর্য্যন্ত, কি মনোজগতে, কি বহির্জগতে, কি সমাজে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই 'বিবর্ত্তন' প্রণালী একই ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। ডারউইনের 'যৌন-নির্ব্বাচন' স্পেন্সারের সার্ব্বভৌমিক দর্শনে 'জীবন-সংগ্রাম' আখ্যা প্রাপ্ত হইল।

প্রকৃত সমাজ-বিজ্ঞান বলিয়া কোন তত্ত্ব স্পেন্সারের পূর্ব্বে জগতে কেহ প্রচার করেন নাই। সমাজ-শরীরও যে অনেক পরিমাণে জীব-শরীরেরই অনুরূপ। অর্থাৎ জীব-শরীর যে প্রকার সরল ও আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইয়া জটিলতর অবস্থায় নীত হয়, সমাজ-দেহও সেই প্রকার আদিম সরল অবস্থা হইতে বর্ত্তমান জটিল অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। এই তত্ত্ব নানা প্রকার উদাহরণ ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া, স্পেন্সারের গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানের পদবীতে সমারূঢ় হয়।

প্রাচীন দর্শনের পন্থা অবলম্বন না করিয়া স্পেন্সারই সর্ব্ব-প্রথমে সমস্ত বিজ্ঞানকে দর্শনের অঙ্গীভূত করেন। তাঁহার "System of Synthetic Philosophy" অলৌকিক প্রতিভা, অশেষ শ্রমশীলতা ও প্রচুর ভূয়োদর্শনের ফল।

কোন কোন সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, তাঁহার প্রোজ্জ্বল প্রতিভার আলোকে আধুনিক দর্শন উদ্ভাসিত। বিচ্ছিন্ন, অসম্বদ্ধ ও শৃঙ্খলাবিরহিত মানবীয় জ্ঞানরাশির একীকরণ ও অখণ্ডত্ব, স্পেন্সারের প্রতিভার দ্বারা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হইয়াছে।

চিন্তা-রাজ্যে নিয়ত বাস করিয়া দার্শনিক কল্পনার কুহক হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন না। জগতের ক্রম-বিকাশ বর্ণনা করিতে করিতে কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যতকে নিজের মতানুযায়ী করিয়া গড়িয়া ফেলেন। যুদ্ধবিগ্রহের যুগ অতিক্রান্ত হইলে মানব সমাজ ক্রমশঃ শ্রমশিল্পের যুগে উপস্থিত হয়, স্পেন্সার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষভাগে, সুসভ্য জাতিসমূহের সমর-প্রিয়তা ও জিঘাংসার উদ্রেক দেখিয়া তিনি শোকভারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন এবং জগতের তথাকথিত সভ্যজাতিনিচয় যে বর্ব্বরতার দিকে পুনরায় অগ্রসর হইতেছে, ইহা মনে করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত তথ্য ও ভাষ্য নামধেয় গ্রন্থে Rebarbarization 'পুনঃবর্ব্বরতা' বিষয়ক প্রবন্ধে সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

"Thus on every side we see the ideas and feelings and institutions appropriate to peaceful life, replaced by those appropriate to fighting life.

The continual increase of the army, the formation of permanent camps, the institution of public military contests and military exhibitions, have conduced to this result."

চতুর্দ্দিকেই শান্তির অনুকূলভাব ও ক্রিয়া-কাণ্ডের পরিবর্ত্তে সমর-প্রিয়তার অনুকূলভাব ও ক্রিয়া-কাণ্ডের অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইবে। সৈন্য, সৈন্যাবাস ও সামরিক প্রদর্শনীবাহুল্য হইতেই এই যুযুৎসার অভ্যুদয় অনুমিত হইবে।

যে রাষ্ট্রনীতি, আজ কাল স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং যাহার প্রভাবে ধরণী-বক্ষে অবিরাম রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই একাতপত্র জগতের প্রভুত্ব লাভাকাঙ্ক্ষা (Imperialism) তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই রাষ্ট্রনীতি হইতেই তাঁহার মতে দাস-ব্যবসায় ও দাসত্বের আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের রণোন্মত্ততা ও সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া স্পেন্সার গভীর দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন :—

Among men who do not pride themselves on the possession of purely human traits, but on the possession of traits, which they have in common with brutes, and in whose mouths "bull-dog courage" is equivalent to manhood—among people who take their point of honour from the prize-ring, in which the combatant submits to pain, injury and risk of death, in the determination to prove himself "The better man," no deterrent considerations like the above will have any weight. So long as they continue to conquer other peoples and to hold them in subjection, they will readily merge their personal liberties in the power of the State and hereafter as heretofore accept the slavery that goes along with Imperialism.

অর্থাৎ :—যাহারা মনুষ্যোচিত চরিত্র লাভ করা গৌরবের বিষয় মনে না করিয়া, পশুত্বলাভে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে এবং যাহাদের মুখে সর্ব্বদাই "সারমেয়তুল্য সাহস"ই মনুষ্যত্ব বলিয়া শুনা যায় এবং যাহারা যশাকাঙ্ক্ষায়, ব্যবসায়ী পালোয়ান-দিগের ন্যায় নানাপ্রকার শারীরিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের নিকট এই নীতি বিরুদ্ধে অন্য কোন যুক্তিই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যতদিন তাহারা অন্য জাতিকে পরাজিত করিতে ও অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে উৎসুক থাকিবে, ততদিন তাহারা তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রাজশক্তির নিকট বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত রহিবে, এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে এই নীতির ফলস্বরূপ দাসত্বকে আলিঙ্গন করিবে।

জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ স্পেন্সারের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, কিন্তু এই পশুত্বের অভিনয় যে বর্ত্তমান সভ্য জাতির অধোগতির সূচনা করিতেছে তাহা সত্য। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে লিপ্ত না থাকিয়াও তাঁহাকে তাঁহার মতানুসারে জাতিসমূহের ক্রিয়া কলাপ ও উন্নতি ও অবনতি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং তিনি জ্ঞানযোগী হইয়াও সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক বিষয় সমূহ হইতে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থিতি করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদাসীনতা, প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহে অনাস্থা, পরকালে অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণে অনেক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি তাঁহার গ্রন্থাদি আশানুরূপ

আদরের সহিত পাঠ করেন নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে যাঁহারা বাহিরে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট স্পেন্সারের গ্রন্থরাজি বহুসম্মান ও আদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার অনেকানেক গ্রন্থ জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য জাতি সমূহের ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার চিন্তা জগতের জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আমাদের অধঃপতিত দেশের পরম সৌভাগ্য যে, এই মহাপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে জনৈক ভারতবাসী তাঁহার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া তাঁহার নামে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ কবরস্থ না করিয়া অগ্নিতে দাহন করা হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল এবং তদনুসারে তাঁহার দেহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। কি জীবনে কি মরণে, সর্ব্বকালে ন্যায় ও যুক্তির আশ্রয় অবলম্বন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। মৃত দেহ ভস্মসাৎ করা কর্ত্তব্য, সুতরাং প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়াও 'আমার সম্বন্ধে সে কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হউক—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও জ্ঞানী জন মর্লি, কি লিওনার্ড কার্টনী তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে বক্তৃতা করেন, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, জন মর্লির অনুপস্থিতিতে কার্টনী অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় বক্তৃতা করেন। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইনি মৃত হইয়াও জীবিত।

ইচ্ছা-শক্তি

মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। তখনই শিশুর বদন কমল হইতে 'ওঁঞা' 'ওঁঞা' শব্দ বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই মল-মূত্র বহির্গত হইল। বহিরালোকের ক্রিয়ায়, শিশুর নয়ন-যুগল উন্মীলিত বা নিমীলিত না হোক্, স্পন্দিত হইতে লাগিল। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ও ধমনীতে রক্ত স্রোতের গতি অনুভূত হইতে লাগিল। শিশুর দেহ-যন্ত্রের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বা স্বতঃ-প্রণোদিত ক্রিয়া প্রারব্ধ হইল। এই সমস্ত লক্ষণ এবং জননীর বক্ষের স্তন্যপান দ্বারা, শিশুটি সঞ্জীবিত ও প্রাণবান্, ইহা স্থিরীকৃত হইল। শিশু দেহে জৈবিক জীবনের সমস্ত চিহ্নই প্রকাশমান হইল।

কিন্তু এ যাবৎ শিশুর মনের বা মানস জীবনের কোনো লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদানুভূতি; বুদ্ধি ও ইচ্ছার কোনো নিদর্শন দেখা গেল না। কেবল ইচ্ছা-নিরপেক্ষা ও সহজাত-সংস্কারমূলা ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম, শিশুর 'ওঁঞা' 'ওঁঞা' ধ্বনিতে, কেহ কেহ বিষাদের বা দুঃখের অভিব্যক্তি দেখিতে পান্ অথবা কোন প্রকারের 'অভাব' জন্য ক্রন্দনই অনুমান করেন। আবার কেহ কেহ কল্পনাবলে, শিশুর এই ক্রন্দনকে, শোক দুঃখ বহুল পৃথিবীতে, শিশুর আগমনী শোক-

গীতি বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। অমৃতের ও আলোকের রাজ্য ছাড়িয়া মরণশীল অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশে জাতিস্মর শিশু দুঃখ প্রকাশ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ 'ওঞা' 'ওঞা' ধ্বনি, শিশুর স্বর ও শব্দ প্রকাশ ক্ষমতারই পরিচায়ক ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই সমস্ত স্বতঃপ্রণোদিতা ও ইচ্ছানিরপেক্ষা ক্রিয়াগুলি হইতে ক্রমশঃ 'ইচ্ছার' উদ্ভব ও বিকাশ কি প্রকারে হইল, তাহাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব এবং তৎপরে এই ইচ্ছাই যে শক্তি, তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিব।

স্নায়ুবিমণ্ডিত শিশু সহজেই হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করে, সুতরাং এই হর্ষ ও বিষাদানুভূতিকে, অতি মৌলিক প্রকৃতি বলিয়া মনে করিতে পারি। শৈত্য ও উষ্ণত্ব, হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি দ্বন্দ্বানুভূতি মানবের জ্ঞান ও ইচ্ছার মূলে, সমস্ত জ্ঞানই দ্বন্দ্বাত্মক। 'ঘটের' জ্ঞান ও 'ঘটাতিরিক্ত' পদার্থের জ্ঞান একই সময়ে জন্মে এবং 'ঘটের' জ্ঞান ও 'ঘটাতিরিক্ত' পদার্থের জ্ঞানের অপেক্ষা করে। 'ঘট'কে জানিতে হইলেই, যাহা 'ঘট' নয়, তাহাকেও জানিতে হয়।

জীব কেন হর্ষ ও সুখের অনুসন্ধান করে এবং তজ্জন্য লালায়িত হয়, তাহার কারণ হয়ত এই যে, হর্ষ ও সুখ জীবের জীবনী শক্তি বর্দ্ধন করে; এবং জীব কেন বিষাদ ও দুঃখ পরিহার করিতে চায়, তাহার কারণও হয়ত বিষাদ ও দুঃখ জীবের জীবনী শক্তি হ্রাস করে বা তাহার অপচয় ঘটায়।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বেইন্ উহা হইতেই মনো-বিজ্ঞানের একটি প্রাকৃতিক নিয়মের (Law) উদ্ধার করিয়াছেন। এবং তিনি ঐ নিয়মটিকে 'আত্ম-রক্ষার' নিয়ম সংজ্ঞায় (Self conservation) সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

মাতৃবক্ষের পীযূষ ধারা শিশুর মুখে পড়িলেই, তাহার হর্ষ বা সুখের উপগম হয়, এবং তাহাতে তাহার জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শিশু স্তন্য লাভের জন্য হস্তোত্তলন ও মুখব্যাদন করে এবং পুনঃ পুনঃ মাতৃস্তন্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। যাহাতে হর্ষ বা সুখ পায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে চায়। ইহাই স্তন্য লাভের 'আকাঙ্ক্ষা' বা 'কামনা,' এই পুনরাবৃত্তিই **ইচ্ছা**, এবং ইহাতেই ইচ্ছার উন্মেষ। মাতৃস্তন্যের সুস্বাদ ও সঞ্জীবনী শক্তি হইতে, শিশু যে স্ফূর্ত্তি লাভ করে তাহাতেই পুনরাবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

বিষাদ, দুঃখ বা ক্লেশের দিক্ দিয়া দেখিলেও এই নিয়মেরই অনুবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইবে। অগ্নি-শিখা শিশুর নয়ন-যুগল আকর্ষণ করে। পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত বহ্নি দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, মানবশিশুও সেই প্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নিটকস্থ হইতে চায়। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া, যখনই অগ্নির উত্তাপকে পীড়াদায়ক বা ক্লেশদায়ক অনুভব করে, তখনই তাহা হইতে দূরে থাকিতে চায় বা তাহার দূরে থাকিবার আকাঙ্ক্ষার উদ্গম হয়। অগ্নিতে হস্ত বিক্ষেপ যদি সুখকর হয়, তবে অগ্নির দিকেই হস্ত বিক্ষেপ

করে ; আর যদি তাহা পীড়াদায়ক হয়, তবে তাহা হইতে হস্ত সংকুচিত করে বা টানিয়া আনে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে. প্রথমতঃ শরীরে যে সমস্ত ক্রিয়ার স্বতঃ উৎপত্তি ঘটিত, যাহা উদ্দেশ্য ও ইচ্ছানিরপেক্ষ ছিল, তাহাই পূর্ব্বোক্ত কারণে ও পৌনঃপুনিক আবৃত্তিতে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য-মূলক এবং ইচ্ছাসাপেক্ষ হইয়া উঠে। শুধু মনের দিক দেখিতে গেলে, ইচ্ছার উৎপত্তির ও বিকাশের এই ক্রম।

জীবদেহে, বিশেষতঃ মানব দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই স্বতঃ ক্রিয়া কোথা হইত আসিল ? অঙ্গচালন শক্তির মূল কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তর মনোবিজ্ঞানে মিলিবে না। উহার উত্তর দর্শনে ও অন্যোন্য বিজ্ঞানে পাওয়া যাইতে পারে। জীব দেহে সম্মিলিত জীব কোষ সমূহে (Nucleated cells), আহার দ্বারা পুষ্ট হইলে এবং তৎপূর্ব্বেও প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহাতে শক্তি সঞ্চার হয়। রসায়ন ও জীবদেহ-বিজ্ঞান, ইহাই বলিবে। এই দিক্ দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছার মূলে গতিশীলা কি স্থিরা (Kinetic or dynamic enegy) শক্তি।

বস্তুতঃ আমরা যে মানবেচ্ছার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার শক্তি এবং জগতে যে বহুতোমুখিনী শক্তি দেখিতে পাই, তাহা একই শক্তি। মানব শিশুর কতগুলি স্বতঃ প্রণোদিতা শারীর-ক্রিয়া, অত্যল্পকাল মধ্যেই, তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার বিকাশের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায় ; এবং সুবিশাল মনোজগৎ তদুপরিই প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভূলোকে, দ্যুলোকে, ওষধিতে, বনস্পতিতে, স্থাবরে, জঙ্গমে, ভীম প্রভঞ্জনের বিপুল বিক্রমে, মেঘের ভৈরব গর্জ্জনে, সাগরোর্ম্মির উদ্দাম নৃত্যে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্রাদির প্রচণ্ড ঘূর্ণনে আমরা যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, সেই শক্তি ও মানব শিশু যে ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহার হস্ত উত্তোলন করে, পদদ্বয় বিক্ষেপ করে, তাহাতে কি কোনো পার্থক্য আছে ?

শক্তি কাহাকে বলি ? যাহাতে পদার্থের গতি জন্মায় বা পদার্থকে গতিশীল করে, তাহাই শক্তি ; জড় বিজ্ঞানে শক্তির এই সংজ্ঞা। শিশু হস্ত দ্বারা তাহার ক্রীড়া কন্দুকটি পরিচালিত করিল বা তাহাকে গতিশীল করিল, ইহা দ্বারা শিশুর হস্তের বা তাহার শক্তি প্রকট হইল। যদি হঠাৎ হস্ত সংস্পর্শে সেই কন্দুকটি পরিচালিত হইত, তবে আর তাহা শিশুর ইচ্ছোদ্ভূতা গতি বলিতাম না ; ক্রীড়া ব্যপদেশে পরিচালিতা হইলে, সেই গতিতে শিশুর ইচ্ছার ক্রীড়া দেখিতে পাইতাম। পদার্থের উপরে শক্তির ক্রিয়ার নিয়ম ও প্রকৃতি একই প্রকারের। তবে জড়শক্তি ও ইচ্ছাশক্তিতে বিভেদ কোথায় ? ইচ্ছাশক্তি চৈতন্যোপহিতা—আর তথাকথিতা জড়শক্তিতে স্থূল দৃষ্টিতে চেতনা বা সেই বিশেষত্ব-টুকু দেখিতে পাই না। আর নাই বা দেখিতে পাই, বলি কেন ? জড় শক্তির জ্ঞানত 'আমার ইচ্ছাশক্তি' হইতে লব্ধ। যখনই কোন জড়শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, তখনই তাহা 'আমার শক্তি' বা আমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিমাপ করি, যন্ত্রের সাহায্যে কোনো ভারী পদার্থ উত্তোলিত হইলে, তাহা আমি তুলিতে পারি

কি না, অথবা আমার ন্যায় কয়জনে তুলিতে পারে, তাহাই বিবেচনা করি। বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত যন্ত্রশক্তিই ঘোটকের শক্তি (Horse power) দ্বারা পরিমাপ করেন।

বাষ্পের শক্তি অঙ্গারে বা কয়লায়, এবং অঙ্গার ও কয়লার শক্তি উদ্ভিদ কোষে। জীব শক্তিও তাহার আহারে; এবং আহার্য্য সেই উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ কোষ সমূহ, জীব ও জড় শক্তির মূল এক স্থানেই। আমার শক্তি বা আমার ইচ্ছার শক্তি—যাহা চৈতন্যবিশিষ্টা, আর জড় শক্তিতে মূলতঃ কোন বিভেদ নাই, ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

আর যাহাকে জড় শক্তি বলিতেছি, তাহাই যে চৈতন্যোপহিতা নয়, ইহা কে বলিল? তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? তোমার শক্তি তোমার 'চৈতন্যোপহিতা' হইতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা 'চৈতন্যোপহিতা' নয়। তোমার শক্তিও আমার পক্ষে জড় শক্তি। আর যাহাকে জড় শক্তি বলিতেছি, তাহা 'তোমার' এবং 'আমার' চৈতন্যের বাহিরে বলিয়া কি জড়? ইহাও ত ন্যায়ানুমোদিত কথা নয়। তোমার শক্তি যদি চৈতন্যোপহিতা মনে করিতে পারি, তবে যে শক্তি, 'তোমার' 'আমার' এবং 'তাহার' চৈতন্যের বাহিরে, তাহাকে চৈতন্যোপহিতা বলিতে পারিব না কেন? যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া 'আমার শক্তিকে' ইচ্ছাশক্তি বা চৈতন্যোপহিতা বলিতেছি, ঠিক্ সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই জগতের সমস্ত শক্তিকে চৈতন্যোপহিতা বলিতে পারি।

আমরা (আমি, তুমি এবং তাহারা) যে চিৎ-স্বরূপের কথা বা যে চিদ্ঘনের আংশিক অভিব্যক্তি, জগতের সমস্ত শক্তিই সেই চিৎশক্তি-প্রসূতা।

যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বলি, অর্থাৎ আমি ছাড়া আর সব্ বলি, তাহার অস্তিত্ব আমার নিকট কি ভাবে প্রতীয়মান হয়? যাহা আমার ইচ্ছাকে প্রতিহত করে বা তাহাতে বাধা জন্মায় তাহাই আমার বহির্জগৎ। আমি সরল রেখা অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, অন্য পদার্থ দ্বারা আমার গতি রুদ্ধা হইল, এই গতি-রোধক শক্তিই আমার নিকট 'অন্য পদার্থ' বা বহির্জগৎ।

আমার ইচ্ছা সর্ব্বদাই অন্য শক্তি বা ইচ্ছা দ্বারা প্রতিহতা হইতেছে। ইহাতে স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হইবে যে আমার ইচ্ছা ছাড়া, অপর এক ইচ্ছা বা শক্তি আছে, যাহা প্রতি নিয়ত আমার ইচ্ছা বা শক্তির উপর আঘাত করিতেছে। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, আমার এই দেহেই কত প্রকারের ইচ্ছা-নিরপেক্ষা শক্তি আছে, এবং আমার শক্তির জ্ঞান কি 'আমিত্ব' তাহা হইতেই জন্মে।

তাহা হইলে আমি যাহাকে 'আমার' ইচ্ছা বা 'আমার' শক্তি বলিতেছি, আর সেই আমার ইচ্ছা প্রতিরোধক শক্তিতে বিভেদ কোথায় রহিল?

একই শক্তি যদি জগতের মূলীভূতা হয়, তবে সেই শক্তিও একই ইচ্ছা সমুদ্ভূতা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই শক্তি বা

ইচ্ছাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্ষয়ের কারণ বটে। সমস্ত শক্তিই ইচ্ছাময়ী, ইহাকে 'কুণ্ডলিনী'ই বলুন আর 'হ্লাদিনী' বলুন—তিনি ইচ্ছাময়ী।

সিসৃক্ষা ও জিজীবিষাই নানা শক্তিরূপে বিশ্বে প্রকটিতা। ইহাকে ইংরাজীতে 'The will to be or the will to exist' বলা যাইতে পারে।

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ,
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ?"

কে জানে, কে বলিবে, এই জগৎ কোথা হইতে আসিল ? কোথা হতে সৃষ্ট হইল ?

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি,
মনসঃ রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"

আমার মনে কাম বা কামনা উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের উৎপত্তি হেতু।

এই সিসৃক্ষা বা জিজীবিষা, বুদ্ধি বা চৈতন্যের সহিত সংযুক্তা হইলেই তাহাকে আমার ইচ্ছা, আমার 'স্বাধীন ইচ্ছা' (Free will) বলিয়া থাকি।

এই সিসৃক্ষা বা জিজীবিষা সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপিনী। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থেই ইহা পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদের জীবনের পক্ষে আলোকের প্রয়োজনীয়তা সকলেই জানেন। সেই আলোক স্পর্শ বা লাভ করিবার জন্য বর্দ্ধমান উদ্ভিদের কতই

প্রচেষ্টা! উদ্ভিদ জীবনের জন্য যেমন সূর্য্যালোকের প্রয়োজন, তেমন জননী পৃথিবীর রস গ্রহণও আবশ্যক। উদ্ভিদের বীজটিকে যে ভাবেই মৃত্তিকায় প্রোথিত করুন, ইহার মূল রস গ্রহণের জন্য নিম্নগামী হইবে, এবং কাণ্ড ও শিরোভাগ আলোক লাভের জন্য উর্দ্ধমুখী হইবে। ইহাতে তাহার উদ্ভিদ্ বা উর্দ্ধভেদী নামের সার্থকতা। অবলম্বন লাভের জন্য, বালিকা মাধবী সহকার শিশুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে কতই চেষ্টা করে। ইষ্টক ও পাষাণ ভেদ করিয়া কত উদ্ভিদ্, মহামহিমান্বিত সবিতার দিকে তাকাইয়া নীরবে 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং' ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে।

চেতনাবিশিষ্ট জীবের জিজীবিষা ও উদ্ভিদের জিজীবিষায় ত কিছুই পার্থক্য দেখিতেছি না। বিবর্ত্তন বা ক্রম-বিকাশবাদী ডারউইন ও ওয়ালসের মতে যাহা জীবন-সংগ্রাম বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, তাহা বস্তুগত্যা এই জিজীবিষা এবং তাহারই নামান্তর বা রূপান্তর। দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছাই মানবের 'মানবত্ব,' পশুর 'পশুত্ব,' উদ্ভিদের 'উদ্ভিদত্ব' এবং জড়ের 'জড়ত্ব'। অপর দিকে এই ইচ্ছাই শক্তি। যাহাতে, স্থূল দৃষ্টিতে ইচ্ছার বিকাশ দেখিতে পাই না, তাহাও বস্তুতঃ চেতনা-বিরহিতা ইচ্ছা। ইহাকেই জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহুঁয়া এবং হার্টমেন বিরাট অচেতন (The great Unconcious) বলিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও শুধু মানবের 'ব্যক্তিত্ব' বা 'অস্তিত্বে'র আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? আমার ইচ্ছা-প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি-মূলা, যাহাই হউক তাহাই আমার 'ব্যক্তিত্ব'। যদি মানবের ইচ্ছা, কামনা

বা আকাঙ্ক্ষা কিছুই না থাকিত, তবে কি থাকিত?—কিছুই না।

মুকুরে সমস্ত পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইলেও 'মুকুর' ব্যক্তি নয়। আমাদের চিন্মুকুরেও যদি শুধু বস্তুর জ্ঞান থাকিত, তবে কি আমাদের 'ব্যক্তিত্ব' থাকিত?

অস্মদ্দেশে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ও পাশ্চাত্য অমঙ্গলবাদিগণ (Pessimists), যে কামনা পরিশূন্য হইয়া নির্ব্বাণ লাভের জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশের শেষ কথা—ব্যক্তিত্বের বিলোপ; কারণ, কাম, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাই মানবের 'ব্যক্তিত্ব' বা 'অস্তিত্ব'।

এই সংসারকে দুঃখবহুল মনে করিলে এবং সেই দুঃখ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা আবশ্যক হইলে, নিশ্চয়ই সংসারের মূলে যে জিজীবিষা, তাহার উচ্ছেদ বা আত্মহত্যাই বাঞ্ছনীয়। এই সিদ্ধান্ত কেহই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু ইহার মূলে যে সত্যটি নিহিত আছে, অর্থাৎ ইচ্ছাই যে সংসারের মূলীভূতা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তজ্জন্যই ইচ্ছাকে নিয়মিতা ও তদুপায়ে জাগতিক ব্যাপার সমূহের কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য ভারতীয় যোগ শাস্ত্রের উৎপত্তি। অষ্টৈশ্বর্য্য লাভেরও ঐ উপায়।

"অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তিঃ প্রকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিতঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"

আমি বস্তুতঃই কামস্বরূপ। জগন্নির্ম্মাণ কামনাই আমার হ্লাদিনী শক্তি। উহা লীলাময়ী, সুতরাং

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ' ॥

বলিয়া এই ইচ্ছা বা শক্তির মহিমাকে নমস্কার করিতেছি।